১৭ অক্টোবর ১৯৮৪ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

মেলামেলা

বিনামূল্যে উপহার!

গ্লুকন-ডি ®'র

নিমেষে শক্তি যোগানোর সাথে

এক চমৎকার স্টেনলেস স্টীলের চামচ

আপনার রোজকার নিমেষে শক্তি যোগানোর পানীয়কে নেড়ে গোলবার এক চমৎকার জিনিস ··· এই ঝকমকে স্টেনলেস স্টীলের চামচ ··· যা ৪০০ গ্রামের গ্লুকন-ডি প্যাকের সঙ্গেই পাবেন··· একদম বিনামূল্যে !

তরতাজা করা, ঠাণ্ডা আমেজ ভরা, শক্তি যোগানদার গ্লুকন-ডি···যা ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের গুণে ভরপুর !

ফলের রস, দুধ, চা, কফি, জল···যা খুশির সঙ্গে গুলে নিন বা শুধুই খান – তবে, সবকিছু গুলতেই ব্যবহার করুন গ্লুকন-ডি'র বিশেষ উপহারের চমৎকার চামচটি !

GLL-9686

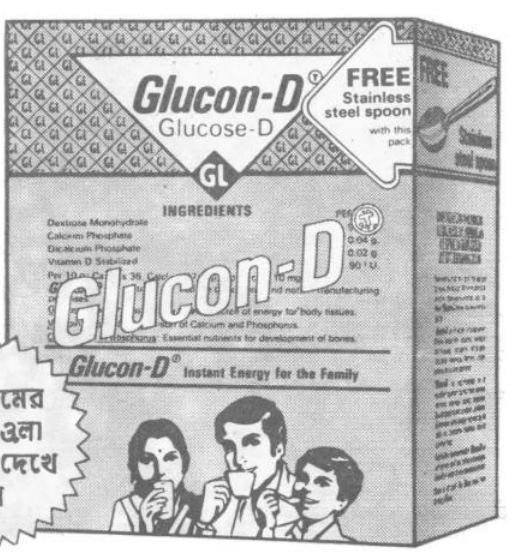

৪০০ গ্রামের উপহারওলা প্যাকটি দেখে নিন

শুধুমাত্র নির্ধারিত বাজারগুলিতে সীমিত স্টক রয়েছে

গ্লুকন-ডি ® –নিমেষে শক্তি যোগানদার

স্বাস্থ্যের উৎস গ্ল্যাক্সো

আনন্দমেলা

৩১ আশ্বিন ১৩৯১ । ১৭ অক্টোবর ১৯৮৪ । ১০ বর্ষ ৮ সংখ্যা

বড়গল্প
মজারুমামা । আশাপূর্ণা দেবী ৩৪
গল্প
ভূতনাথের সেঞ্চুরি । অশেষ চট্টোপাধ্যায় ৯
ভূতেরা সর্বদাই থাকে । মীরা বালসুব্রমনিয়ন ১৫
রাত তিনটেয় টিভির সামনে । জীবন ভৌমিক ৫৩
বাইরে, দূরে
ওলিম্পিকের আসরে । সোমা দত্ত ২৫
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩২
শার্লক হোমসের গল্পমালা
লালচুল সমিতি । অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ৫৬
ইতিহাসের গল্প
শেষ পেশোয়ার অন্তিম । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ৪৫
স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে । পঙ্কজ রায় ৫১
ছড়া
তিন তার্কিক । সাধনা মুখোপাধ্যায় ১৩
লেখাপড়া
বাংলা বলো । বাচস্পতি ৫
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৫
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৭
বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ মালটিপারপাস স্কুল । অপরাজিতা ৩০
খেলাধুলো
আবার গাওস্কর । অশোক রায় ৬২
আজকের মাঠে গতকালের তারকা । মণি শর্মা ৬৫
ইরানি ট্রফি জিতল অবশিষ্ট ভারত । ব্যাটবয় ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা, শব্দসন্ধান ১৮ ; মজার খেলা, উত্তর বটে, হাসিখুশি ১৯
তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

এক্ষুনি লাগান বার্নল—
পুড়ে যাওয়া জখমের
আসল চিকিৎসা!

পোড়ার জখমের সঙ্গে অন্যান্য জখমের অনেক তফাৎ। পুড়ে যাওয়ার জ্বালা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। আর পোড়া থেকে ফোস্কাও পড়ে। এর জন্যে আপনার দরকার পোড়ার জখমের আসল চিকিৎসা —বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম। বার্নল নিমেষে জ্বালা উপশম করে স্নিগ্ধ করে আর ফোস্কাও পড়তে দেয় না। পোড়ার জখম শীঘ্র উপশম করার সব কটি উপাদানই বার্নলে রয়েছে।

সবসময়ে ঘরেতে রাখুন বার্নল।

বার্নল

পুড়ে যাওয়া জখমের আসল চিকিৎসা।

BC.5641

সুপার রিন
আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা
যা আর কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের সাধ্য নেই।

সুপার রিন-এর দিকে আর একটু লক্ষ্য ক'রে দেখুন।
চমৎকার নতুন মোড়ক—আর, আহ্, অপূর্ব এক নতুন সুগন্ধ!

সুপার রিন-এর শুভ্রতার দিকে আর একটু লক্ষ্য করে দেখুন।
সুপার রিন শুভ্রতার শক্তির ভরপুর এক ভাণ্ডার।
এ আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা, যা আর কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের সাধ্য নেই। আপনি নিজেই দেখুন না—সুপার রিনে কাচা জামাকাপড় এমন ধবধবে সাদা হয় যে সবার মাঝে লোকের নজর কেড়ে নেয়।

বাংলা বলো

পলাতক ফলা-রা

"পলাতক ফলা-রা মানে ?"

ততক্ষণে কালো কফির সুগন্ধে হিগিনকাকুর নাকের ডাক বন্ধ হয়েছে, চোখ দুটিও একটু মিটমিট করে সম্পূর্ণ সজাগ হয়েছে। কফিতে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, "এই ধরো, শব্দের গোড়ায় র-ফলা আর ঋ-কার প্রায়ই অনেকের উচ্চারণে উধাও হয়। শোনোনি—'এখানে পোত্তেক (প্রত্যেক) বাড়িতে পোতিদিন (প্রতিদিন) পোচণ্ড (প্রচণ্ড) লোডশেডিং হয়। টিভির পোগ্রাম দেখাই হয় না'।"

বাবা বললেন, "পোফেসর বলেছেন, কী পোকাণ্ড এই পিথিবী !"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও," ভণ্টু বাধা দিয়ে বলল, "আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে সেদিন পড়া দিচ্ছিল। সে দিব্যি বলে গেল 'মিত্যু' (মৃত্যু), 'মিতদেহ' (মৃতদেহ)। কিন্তু সে যেই 'কিস্ন' (কৃষ্ণ) বলেছে, অমনি স্যার এসে তার কান ধরলেন, বললেন, 'কিস্ন' 'বিস্টি' (বৃষ্টি), 'বিদ্ধ' (বৃদ্ধ), 'পোত্তহ' (প্রত্যহ)—এসব কী কথা র‍্যা ? কোন্ জঙ্গল থেকে এয়েছিস ?"

"ওরে, জঙ্গলে যাবার দরকার নেই, এসব এই সি এম ডি এ এলাকাতেই হরদম শোনা যায়।" হিগিনকাকু বললেন, "তবে কথাটা হচ্ছে, গোড়াকার ঐ র-ফলা আর ঋ-কারকে পালাতে দেওয়া চলবে না। শক্ত করে ধরে রাখতে হবে, জিভকে বলতে হবে—"আই-ও, খবরদার ! র-ফলা, ঋ-কার যেন না ফসকায় ! আর য-ফলা !"

"সে কী কাকু, য-ফলাও ফসকে যায় নাকি ?"

"আর বলিসনে বাবা, শব্দের শেষে ঝুলে থাকা য-ফলা তাই-ই করে অনেকের কথায়। সেখানে য-ফলার উচ্চারণ কী, মনে আছে তো ? সে আগের ব্যঞ্জনাটাকে ডবল করে ধাক্কা লাগায়, তাই না ?"

"কিন্তু দ্যাখো, বেশ কিছু লোকের কথায় শুনবে, 'সৈন্য' [শোইন্নো] হয় 'শোইনো', 'দৈন্য' [দেন্নো] হয় 'দোইনো', 'ঐক্য' [ওইক্কো] হয় 'ওইকো'—"

"আমি তো 'ওক্ক'-ও শুনি 'ঐক্য'-এর বদলে।"

"সে অন্যরকমের ভুল গো। তাতে 'ওই'-এর ই-টা খসে যায়। যাই হোক, তোমরা পলাতক 'ফলা'দের ধরে রাখো, এবার আমি নিজে পালাই।"

"নিজে পালাবি মানে ?"

"মানে, আপাতত ভাষাবিজ্ঞানের আসর থেকে বিদায় নেব।" বলে ভণ্টুর থুতনি ধরে আদর করে বললেন, "বল তো সোনা, ভাল উচ্চারণের মোদ্দা কথা কী ?" বলে নিজেই বললেন, "সে কথা হল, আক্কেল। খেয়াল রাখতে হবে কী বলছ, জিভকে কুঁড়েমি করতে দেওয়া চলবে না —ভাল উচ্চারণ শুনে শুধরে নেবে।" বলে চেঁচালেন, "বৌদি, উচ্চারণের ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি বটে, কিন্তু এ-বাড়ির খাদ্যদ্রব্যকে বিদায় জানাচ্ছি না।" (সমাপ্ত)

বাচস্পতি

সহজে ইংরেজি

ছুটিতে বাইরে

ঠিক পুজোর সময়টা কলকাতা ছেড়ে যেতে চামেলির খুবই আপত্তি, তাই চামেলিরা কলকাতায় পুজো কাটিয়ে তবে বেড়াতে বেরিয়েছে। দূরে কোথাও নয়, ট্রেনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ, কিন্তু জায়গাটা মিলির বাবার খুবই পছন্দ। চম্বল আর মিলির, আর মায়েরও তাই।

So they chose Giridih.
At first they thought of going south.
But Mr. Roy didn't like the idea of a long journey by train.
"I would rather go somewhere nearer," he said.
"Not too near, Daddy," Milly urged.
"Well, shall we say a night's journey?" Daddy asked.
It was then that Mrs. Roy mentioned Giridih.
Milly jumped at the idea.
"Giridih will be wonderful," she cried.
Mr. Roy said, "Yes, Giridih would be nice. I'll write to my friend Jagadish and ask if he could let us stay in his house there."
"Do you think he would, Daddy?" Milly asked eagerly.
"I'm sure he would have no objection. The house lies vacant most of the time, anyway," Mr. Roy replied.
Mr. Roy wrote to his friend. The reply came very quickly. It said, Mr. Roy could have the house for as long as he liked.
Mr. Roy's friend wrote, "Do you remember how often I'd asked you to spend a holiday there? But you wouldn't go."
So, when they arrived at Giridih in the evening they found the house all ready to receive them. It was in a nice locality, called Bargonda.
When they woke up early next morning, the air was so fresh, it was a pleasure just to breathe.
Mr. Roy said, "If I had money, I would buy a house here."
Now, with only a few days left of their holiday, they seem to like the place more as each day passes. The Ushri river never fails to delight. The Ushri falls, where they had a picnic, cannot easily be forgotten.
"How would you like to live here?" Mr. Roy asked.
Milly clapped her hands and cried out, "Oh, Daddy, let us."
But Chambal is already thinking of Calcutta and his friends there.

নীচের শব্দটি একটি ক্রিয়াপদের অতীতকালের রূপ, এর ব্যবহার যে অতীত কথা বলতেই করা হয়, তা নয়।

WOULD

It is the past tense of "will"

যেমন ধরো নীচের বাক্যটিতে অতীত কালের কথাই বলা হয়েছে :

He said he would go home.

কিন্তু নীচের বাক্যগুলিতে শব্দটির ব্যবহার অতীতকালের অর্থে নয়। কখনও এতে ইচ্ছা বোঝায় :

I would rather go somewhere nearer.
Do you think he would?

কখনও বা, কী হলে কী হত, এই রকম ভাব প্রকাশ পায়। যেমন, "গিরিডি যাওয়া হবে কিনা জানি না" এমন অবস্থায় বলা যায়

Giridih would be nice.

কিংবা, "এখানে থাকলে কেমন হত ?" এই ধরনের কথা বলতে :

How would you like to live here?

প্রসাদ

বেশী সুস্বাদু
বেশী সম্পূর্ণ

মায়ের মত মমতায় ভরা প্রত্যেকটি চামচ আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য একান্ত উপকারী।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
এটি মেশানো একদম সোজা। এটি খাওয়ানো একেবারে সহজ। প্রোটিনে ভরপুর বলেই শিশুর বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দরকারী।
বাড়তি আয়রন রক্তকে সুস্থ রাখবার জন্য।
সঠিক অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস দাঁত ও হাড় আরো মজবুত করবার জন্য।
শিশুর কোমল হজমশক্তির উপযোগী করে আগেই রান্না করে রাখা হয়েছে।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
আরো সম্পূর্ণ শক্ত আহার।

স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

CLARION/B/GX/4/244 BEN

বিনামূল্যে! শিশুর প্রথম বছরের খাতার জন্যে, পোস্টেজ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ টাকার স্ট্যাম্পসমেত লিখুন ঃ
পোঃ বঃ নং 19119 বোম্বাই (FCM-4) 400 025

লেপ-তোশক রোদে দিই কেন

বর্ষার শেষে বা শীত পড়ার মুখে লেপ-তোশকে রোদ খাওয়ানোর একটা রীতি চালু আছে। কিন্তু কেন ? লেপ-তোশকে যে-সব তুলোর তন্তু আছে, সেগুলি সেলুলোজের। সেলুলোজ হল বহু গ্লুকোজ অণুর সুবিন্যাস করা একটা রাসায়নিক সমষ্টি। এই অণু জল টানে আর অতি সহজেই তা জলে গুলে যায়।

বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি। লেপ-তোশকের তন্তু জল টেনে নিয়ে ভেজা-ভেজা। ফলে তাতে নানা ধরনের ছত্রাক জন্মাতে পারে আর সেলুলোজেরও নষ্ট হওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে যায়। এও এক ধরনের পচন। এই পচন ঠেকানোর জন্যে বর্ষার শেষে লেপ-তোশকে রোদ খাওয়ানো হয়ে থাকে।

বর্ষায় যে আর্দ্রতা চলে আসে লেপ-তোশকে, রোদের গরমে তা বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে যায়। তখন তন্তুপুঞ্জ ফাঁক-ফাঁক হয়ে ফেঁপে ওঠে। ফলে লেপ বালিশে কিছুটা ফুলো-ফুলো ভাব। এই সময়ে ঝাড়াঝাড়ি করলে বা লাঠি দিয়ে পেটালে ধূলিকণা, এমন-কী যদি কোনো সূক্ষ্ম ছত্রাক জন্মে থাকে লেপ-তোশকের তুলোর তন্তুতে, সেগুলিও ঝরে পড়ে।

ডাব কাটলে জল ছিটকে যায় কেন

ডাবে যখন শাঁস থাকে না, তখন ডাবে একেবারে ভর্তি জল। সে জল থাকে একটা চাপের মধ্যে। তার চারদিকেই ডাবের খোলার পুরু আচ্ছাদন। তাই সে-জল বেরোতে পারে না। কিন্তু যেই ডাব কাটা হয়, অমনি বেরোবার প্রথম সুযোগেই জল ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিছুতেই সব জলটা ভেতরে ধরে রাখা যায় না। কেন ?

খোলের ভেতরে জলের চাপ বাইরে যে বাতাসের

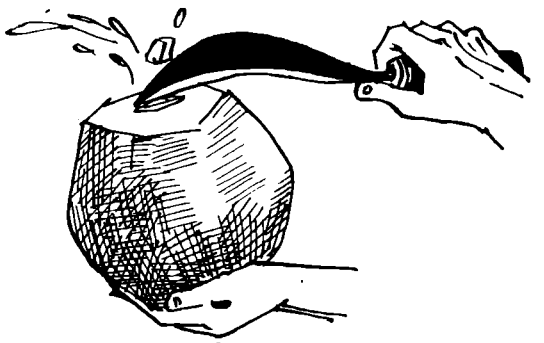

চাপ—তার থেকে বেশি। জল বেশি চাপের থেকে কম চাপের দিকে যাবে, প্রকৃতির নিয়মই এই। তাই জল ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

মেঘ ডাকলে রেডিওতে কড়কড় শব্দ হয় কেন

আকাশে মেঘ ডাকল আর রেডিও কড়কড় শব্দ করে উঠল। কেন ?

রেডিওতে যে গান-বাজনা আলাপ-আলোচনা হয়, তা বেতার-স্টেশন থেকে রেডিও পর্যন্ত আসে একটা তরঙ্গ ভর করে। এই তরঙ্গটার নাম ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভ বা তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। বেতারকেন্দ্র থেকে পাঠানো তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ গ্রাহক রেডিওর এরিয়ালে ধরা পড়ে আর রেডিও তা আবার শব্দে বদলে নেয়। এইভাবেই রেডিওর অনুষ্ঠান আমরা শুনতে পাই।

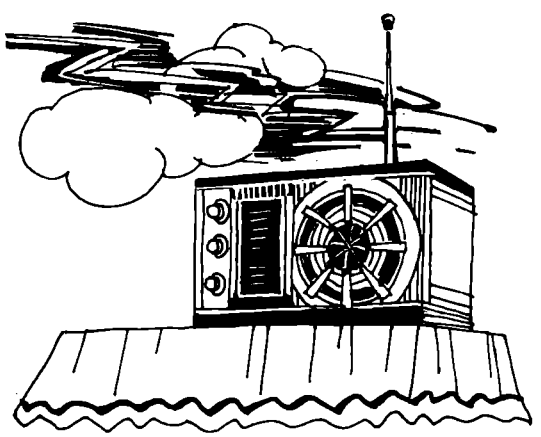

তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি হয় নানা কারণেই। যখন মেঘ ডাকে বা বিদ্যুৎ চমকায় বা রেডিও চলবার সময়ে কেউ এসে কলিং বেল বাজায়, তখন বা এ-রকম আরও অনেক কারণেই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হতে পারে। আর এই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ রেডিওর এরিয়ালে ধরা পড়লেই যে-শব্দ রেডিওতে আসার নয়, তাও চলে আসে। আর তাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাঝে অবাঞ্ছিত কড়কড় শব্দ হয়।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

মাম্মি ও বাপি,
আমার জন্য জেমস আনতে
ভুলবেনা কিন্তু।
আদরের
নিখিল

আজ যখন তুমি জেম্‌স আনবে ঘরে
দেখবে কি মজায় মন উঠবে ভরে
ছোটখাটো দেখতে চকলেটে ঠাসা
খেলতে আর খেতে পাবে মজা খাসা

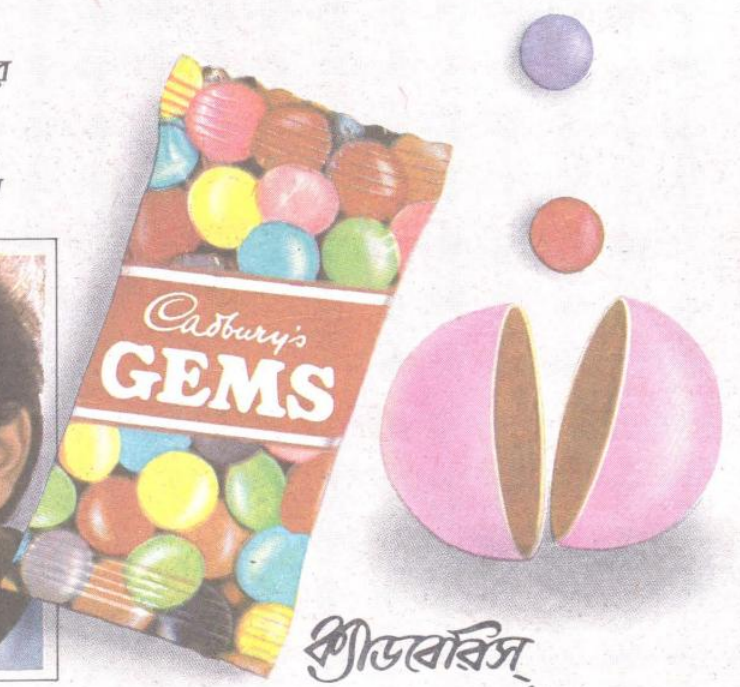

ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্

OBM/3512 BEN

ভূতনাথের সেঞ্চুরি

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

সিঁড়ির নীচে সারবন্দী লেটার-বক্স। একটার ওপর বাংলায় লেখা : তরুণ মুখোপাধ্যায়। তার তলায় একটু ছোট হরফে ফ্ল্যাটের নম্বর, সেই সঙ্গে বাড়তি খবর—তিনতলা। একটু পুরনো ধরনের বাড়ি। হাল আমলের মালটিস্টোরিড বা পেল্লায় জুতোর বাক্সমার্কা বাড়ির মতো দুটো তলার ফারাক কম নয়। তিনতলায় উঠতে গেলেও বেশ সিঁড়ি ভাঙতে হবে। তবু বুঝলাম আমি, অর্থাৎ দু-নম্বর তরুণ মুখোপাধ্যায়, ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছি।

আমাদের ছোটবেলায় অমল, বিমল, অরুণ, বরুণ, তরুণ—এই সব নামের ছড়াছড়ি। প্রতিটি স্কুল-কলেজে এক নামে একের বেশি ছেলে। হরবখত নামের ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট। তখন নরেন, সুরেন, জিতেন নামের মালিকরা অরুণ-বরুণ-তরুণদের বাবা। আজকালকার মতো অভিধান দেখে নামকরণের চল হয়নি তখন। খোকন নামটা চুলদাড়িপাকা লোককেও খোকা বানিয়ে রাখত।

স্কুলে আমাদের সেকশানেই তিনজন তরুণ। দুজনের আবার একই পদবি, মুখোপাধ্যায়। আর একজন সরকার। রোলকলের রেজিস্টারে একজন তরুণ মুখোপাধ্যায়ের নামের পাশে নাম্বার ওয়ান লেখা। অন্যজনকে তাহলে নাম্বার টু হতেই হয়। দু-নম্বর হবার জন্যে অবশ্য আমার কোনো দুঃখ ছিল না। বুদ্ধিশুদ্ধি, লেখাপড়া, ডানপিটেমি সব দিক দিয়েই অন্য তরুণ মুখোপাধ্যায় এক নম্বরের আসল হকদার। ম্যাট্রিক থেকে এম· এ· পর্যন্ত সব পরীক্ষায় কখনও ফার্স্ট ডিভিশন, কখনও ফার্স্ট ক্লাস। এইরকম সাংঘাতিক রেজাল্ট করলে বাকি জীবনটা লেখাপড়া নিয়েই থাকতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর চাকরি বাঁধা। এক নম্বর তরুণও সেই ছকের মধ্যে। আমি, মানে দু-নম্বর তরুণ, গোড়া থেকেই এক নম্বর থেকে অনেক বেশি পিছিয়ে।

তিনতলায় উঠে তরুণ মুখোপাধ্যায় লেখাটার সঙ্গে ফের দেখা। উলটো দিকের ফ্ল্যাটের দরজায় আরেকটা নাম ইংরিজিতে : টি· কে· মুখার্জি। ইনি তরুণ না তপন না তাপস, কে জানে! এক নম্বর তরুণের হাতের লেখা ছিল প্রায় রবীন্দ্রনাথের কার্বন কপি। নীচের লেটার-বক্স আর তিনতলার দরজার ওপর লেখা নামটা একই ছাঁদের। টি· কে মুখার্জি থেকে মুখ ফিরিয়ে সামনের দরজায় কলিং বেল টিপলাম। মনে হল একটা অজানা বিদঘুটে জানোয়ারের পেট টিপে

ফেলেছি। ক্যাঁ করে পিলে-চমকানো কলিং বেল তো নয়, যেন বার্গলার অ্যালার্ম। শক না লাগলেও হাতটা ছিটকে লাফিয়ে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে খ্যানখেনে গলায় অভ্যর্থনা : মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব, অলপ্পেয়ে, মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব। কাঁসার একটা বগিথালা হাত থেকে মেঝের ওপর পড়ে গেলে অনেকটা এই ধরনের শব্দ হয়। তবু মনে হল, এই সাংঘাতিক প্রীতি-সম্ভাষণ যাঁর গলা থেকে বেরোল, তিনি সম্ভবত এই বাড়ির কর্ত্রী।

একে তো কলিং বেলের বিটকেল শব্দ। তার সঙ্গে মানানসই গলায় কাংস্যবিনিন্দিত কথাটার উদাহরণ। ছোটবেলায় গয়লার হাতছুট গোরুর দৌড় বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরাত। এখনও রাস্তায় গাড়ি আচমকা ব্রেক কষলে আমি ঘরের ভেতরে থাকলেও চমকে উঠি। মনে হল খানিকটা শিরীষ কাগজ গিলে ফেলেছি।

সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড়িয়ে নেমে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় দরজাটা হুট করে খুলে গেল। যে মুখখানা দেখা গেল, তার সঙ্গে ঠাকুরমার ঝুলির একটি ছবির বেশ মিল আছে। যার ছবি, তার মুখে "পাঁটা কঁটকঁট কঁরছে লোঁ নাঁতনি" সংলাপটি আছে।

"এ আবার কে গো !" আর একবার কাঁসার থালা পড়ল মাটিতে। শনের নুড়ি দিয়ে বাঁধানো কোঁচকানো কালো মুখে রাগী দারোগার চোখ। রাগ ছাড়াও সেই চোখমুখে বাসা বেঁধেছে রাজ্যের সন্দেহ।

শুকনো শিরীষ কাগজ থুতুতে ভেজে না। কিন্তু চুপ করে থাকলে ভাঙা কাঁসি দমকলের ঘণ্টা হয়ে যেতে পারে।

"তরুণ আছে ?" আমার গলা দিয়ে অন্য কেউ কথা বলল।

"না, সে বাজারে গেছে," কাঁসার থালা এবারে পড়ল পাপোশের ওপর। সেই দারোগামার্কা চোখজোড়া সমানে ঝাঁটা বোলাচ্ছে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

বলার ইচ্ছে ছিল, আমি তরুণের ছোটবেলার বন্ধু। ঠোঁটও নড়ল, কিন্তু স্পষ্ট কোনো আওয়াজ বেরোল না। কথাগুলো শুষে নিল গলার মধ্যে শিরীষ কাগজ।

"কী বলছ বিড়-বিড় করে ?" ধমকে উঠেই সেই বাঘা গলা নেমে গেল কয়েক পর্দা, "বুঝেছি, তুমি বাবুনের নতুন গানের মাস্টার।"

আমার নতুন পরিচয় জেনে পিনপিন করে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। জীবনে খাওয়া আর হাই তোলা ছাড়া হাঁ করিনি। জনগণমন পর্যন্ত মনে মনে আবৃত্তি করি অন্য সবাই যখন কোনো অনুষ্ঠানের শেষে জাতীয় সঙ্গীত গায়।

"আমি একটু জল খাব।" কথাগুলো কোনোরকমে উগরে দিলাম। ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করলে অনেক কথা বলতে হবে। তার আগে জল খেয়ে গলাটা ভেজানো দরকার। ছোটবেলায় পড়েছিলাম, জলের আর এক নাম জীবন। মনে হল এই মুহূর্তে এক গ্লাস জল আমার কাছে জীবনদায়ী ওষুধের মতো দরকারি।

দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে একটা কাজ চালানো গোছের বসবার ঘর। ধরে নিলাম এটা গৃহপ্রবেশের আমন্ত্রণ। যদিও একান্ন বছর বয়েসে আমার মোট আটচল্লিশ কে জি ওজন, আমার হাঁটুর আর শরীরের ভার বইবার ক্ষমতা বিশেষ ছিল না। নাগালের মধ্যে একটা চেয়ার পেয়ে বুঝলাম, বসে পড়াটা আমার পক্ষে খুবই প্রয়োজন।

"পাড়ার ছেলেগুলো ভারী শয়তান, খালি-খালি বেল টিপে পালিয়ে যায়," কৈফিয়ত দিতে দিতে খ্যানখ্যানে গলার মালিক ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে ওপারে।

সামনের দেওয়ালে মস্ত একখানা মা-কালীর মুখ। মাটির তৈরি। জিভটা বাড়াবাড়ি রকমের বড় এবং লাল। দেখলে ভক্তির চেয়ে ভয়ই বেশি হয়। কবে দেবীকে একগাছা মালা পরানো হয়েছিল। তারপর খোলার কথা আর খেয়াল নেই। তার নীচেও আর এক দফা মা কালী। এবারে ক্যালেণ্ডারের ছবিতে। তরুণ কলেজে পড়ার সময় তো একেবারে কালাপাহাড় ছিল। এখন বোধ হয় কালীভক্ত হয়েছে। কে জানে ? পঁচিশ বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। পৃথিবীর ম্যাপে কত জায়গায় ওলটপালট হয়ে গেছে। মানুষের বদলাতে তো একটি মুহূর্তই যথেষ্ট।

হা-পিত্যেশ করে বসে আছি। মনে মনে বলছি : তৃষ্ণার জল এসো এসো হে। কবে যেন পড়েছিলাম, কে যেন খাবার জল চেয়ে আধখানা বেল পেয়েছিল। আমার তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে যে জীবটি এল, তাকে দেখে আমার বুকের মধ্যে একটি হণ্ডা জেনারেটার চালু হল। একটি সাংঘাতিক স্বাস্থ্যবান কালো কুকুর। কুস্তিগির, মুষ্টিযোদ্ধাদের ঢঙে সারমেয়দের ওজনমাফিক শ্রেণীবিভাগের চল থাকলে এটিকে বোধহয় হেভিওয়েটে ফেলা যেত। তার পোড়া হাঁড়ির মতো বিরাট মাথায় দুটি ঢাব্বুল সাইজের মার্বেল বসানো। ডাকাডাকির কোনো ব্যাপার নেই। এসেই আমার পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের অংশের সুলুকসন্ধান নিতে লাগল শুঁকে শুঁকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল : (১) ছোটবেলায় একটা রাস্তার কুকুর কামড়ানোতে আমাকে পেটে চোদ্দটা ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছিল। (২) যে কুকুর ডাকে না, সেই কুকুরই কামড়ায়। তাই বেড়াল যদি বাঘের মাসি হয়, কুকুর বহুকাল হল আমার কাছে বাঘের বদরাগী জ্যাঠা কি কাকা হয়ে আছে।

কুকুরটার কৌতূহলের আর শেষ নেই। শুঁকছে তো শুঁকছেই। সেই ফোঁস-ফোঁস নিশ্বাসে অক্সি-অ্যাসিটিলিনের ছ্যাঁকা। একেবারে স্ট্যাচু হয়ে বসে রইলুম। কে জানে এই কালাচাঁদের মনে কী আছে। জানলা দিয়ে দেখছি একটি মেয়ে পাশের বাড়ির ছাদে কাপড় মেলছে। কোনো আতঙ্কের ছাপ নেই ওর মুখে। নীচের রাস্তায় পাড়ার ছেলেদের জমজমাট ফুটবল খেলা। এক পক্ষ গোল দিল বোধহয়। শব্দটা ধাঁ-ধাঁ করে উঠে এল তিনতলায়। বাইরে কলকাতার একটা ছুটির দিন আস্তে-আস্তে বুড়িয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যেই শুধু সময় পায়ে শেকল পরে দাঁড়িয়ে।

বিস্ময় অনেক সময় ভয়ের মতো মারাত্মক হতে পারে। এই জ্ঞানটি আমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। তেষ্টার কথা যখন প্রায় ভুলে গেছি, তখনই এল জল। সেই জলের যে বাহক, তাকে দেখে পায়ের কাছের বিভীষিকাটির কথা আর খেয়াল হল না। বয়েসে মনে হয় সে বালক ; বালক না শুধু, বিস্ময়-বালক, ওয়াণ্ডার-বয়। রাজা সীতারামের এক সেনাপতি ছিলেন। নাম মেনা হাতি। মনে হল তাঁর পুনর্জন্ম হয়েছে।

সামনের নিচু টেবিলে ঠক করে গেলাসটা রাখল সেই

অতিকায় বালক। চোখ তো নয়, একজোড়া কালো ফুটকি-দেওয়া পোলট্রির ডিম। চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। আমাকে দেখে আর আশ মিটছে না। আমি যেন চিড়িয়াখানার আজব কোনো জন্তু। এ-ঘরে ঢোকার পর থেকেই আমি পুরোপুরি বোবা। মনটা অবশ্য জেগেই আছে। পায়ের কাছের কালাচাঁদ তার দোসর পেয়ে উলটো দিকে ঘুরল। এই ঘোরাঘুরির ব্যাপারটা ঘটল নিচু টেবিলটার তলায়। কৃষ্ণকান্ত খাড়াইতে টেবিলটার চেয়ে বেশি। ধাক্কাধাক্কিতে জলের গেলাসটি অভিমান করে শুয়ে পড়ল। অমনি খানিকটা কনকনে ঠাণ্ডা ফ্রিজের জল আমার পা-দুটো ভিজিয়ে দিল। সেই কৃষ্ণের জীবটিও অবশ্য কর্মফলের দায়ভাগ এড়াতে পারল না। পিঠের ওপর টেবিল থেকে জল গড়িয়ে পড়তেই ঘ্যাঁক করে উঠল। ফটাফট গা-ঝাপটানি। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে গজরাতে লাগল।

সামনে আয়না ধরলে বোধ হয় নিজেকে চিনতে পারতাম না। ধুতির সামনেটা ভিজে শপশপে। বুকের মধ্যে জেনারেটার চলার আর কামাই নেই। ভয় বা বিস্ময় একটা ধাপ পর্যন্ত মানুষের সহ্যের মধ্যে। তার ওপরে গেলে সে তখন হয় নেংটি ইঁদুর, নয়তো সিংহ। ভুলে গেলাম আমি কে, কোথায় এবং কেন এসেছি।

"এর মানে কী ?" আমার গলায় গির অরণ্যের নয়, খোদ আফ্রিকার সিংহ গর্জন করে উঠল। আমি তখন আর আমার মধ্যে নেই। বলে চললাম, "আমি জল চেয়েছিলাম খাবার জন্যে, চান করার জন্যে নয়। আর ওই শয়তান কুকুরটাকে হটাও এখান থেকে।"

রাগ আমাকে একেবারে বাদশাহি মেজাজ এনে দিল। কৈফিয়ত তলব বা হুকুমজারির ক্ষমতা যেন আমার মুঠোর মধ্যে। কিন্তু সেই অতি-বালকের জবাব শুনে আমি আর নবাব নই ; একেবারে তারছেঁড়া ঢ্যাবঢেবে রবাব।

"চেঁচিয়ে কথা বোলো না, তালে ভুতোর সেঞ্চুরি হয়ে যাবে !" অনেকগুলো কোলাব্যাঙ কটকটিয়ে ডেকে উঠল কথা বলার ঢঙে।

"ভুতোটা কে," আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম।

"কামড়ালেই চিনতে পারবে ভুতো কার নাম। নাইন্টি নাইন করে সেঞ্চুরির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এক বছর ধরে। শেষ কামড়েছিল বাড়িওয়ালাকে। তারপর থেকে বাবা মানি-অর্ডার করে ভাড়া পাঠায়।"

"ওই কুকুরটার নাম ভুতো ?" আমি তাড়াতাড়ি চেয়ারের ওপর উবু হয়ে বসলাম। চোখাচুখি হতেই কৃষ্ণকান্ত আবার গোঁ-গোঁ করে উঠল।

"কুকুর বোলো না," সেই বালক ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করে বলল, "বাবা ওকে আদর করে ডাকে শ্রীযুক্তবাবু ভূতনাথ সারমেয় চূড়ামণি। আমি ডাকি ভুতো বলে।"

"না, না," আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "ওকে নাইন্টি নাইনেই নট আউট থাকতে বলো। ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দাও। সেঞ্চুরি না করেও অনেকে নাম কেনে। চেতন চৌহান তো একটাও সেঞ্চুরি করতে পারেনি, তাই বলে কি তার ইজ্জত কম ? আমি বরং ওকে 'করালদংষ্ট্রা শ্বাপদশ্রেষ্ঠ' উপাধি দিচ্ছি।"

"ওই সব খটমটে কথা শুনলে ভুতো ভাববে গালাগাল

দিচ্ছ। ও কিন্তু সব কথা বুঝতে পারে। বাবা বলে, শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ।"

"তবে এখন কী করব ওই মহাকুকুর থুড়ি মহাপুরুষের কামড় থেকে বাঁচতে হলে ?" আমি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম।

"তুমি তো আমার নতুন গানের মাস্টার," বালকের কথায় আমার নতুন পরিচয়টা আবার জেনে চমকালাম। শুনতে লাগলাম আমার রেহাই পাবার উপায়, "গান গাও, ভুতো গান শুনতে খুব ভালবাসে। বাবা বলে, গ্রামোফোন রেকর্ডের ওপর যে গান-শোনা কুকুরটার ছবি আছে, সেটা নাকি ওরই আগের জন্মে তোলা। রোজ সকালে ও আমার সঙ্গে গলা সাধে।"

কুকুরটা থাবার ওপর মুখ রেখে শুয়ে। নজরটা অবশ্য আমার ওপর। মনের মধ্যে কী আছে কে জানে ; এমনিতে দেখে মনে হয় না কামড়াবার মতলব আঁটছে।

আমার মনের মধ্যে একঝাঁক সন্দেহ পিনপিন করছিল। আমার চেনা এক নম্বর তরুণ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রতি দেড় বছরে একখানা করে থান-ইঁট সাইজের বই লেখে। অথচ এই ঘরের মধ্যে বইপত্তর তো দূরের কথা,

একটা পুরনো খবরের কাগজ পর্যন্ত নেই। আর এই যদি তরুণের ছেলে হয়, তাহলে ওর দুর্ভাগ্যের জন্যে সহানুভূতি জানাতে হয়। অথচ নাম, ঠিকানা দুটোই ঠিক-ঠিক মিলছে। পঁচিশ বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তার ওপর কপালগুণে গানের মাস্টার হয়ে আছি। ভরসার কথা আমার চিমড়ে চেহারা খুব একটা বদলায়নি। তরুণ দেখলে চিনবে নিশ্চয়ই ; ভুলটা না হয় তখনই ভাঙানো যাবে।

"তুমি তো সকালে উঠে গলা সাধো শ্রীযুক্তবাবু ভূতনাথের সঙ্গে। তাহলে লেখাপড়া করো কখন ?" তরুণ বাজার থেকে না ফেরা পর্যন্ত কথাবার্তা চালিয়ে যাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি পড়ি না তো," প্রশ্নের পিঠোপিঠি সোজা জবাব। ভদ্র পরিবারে জন্মালে ভাল লাগুক না লাগুক দুটো কাজ করতেই হয়। টুথ-ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত মাজা আর লেখাপড়া করা। এ রকম সরল উত্তর ঠিক আশা করিনি।

"সে কী !" এত জোরে কথাটা ছিটকে বেরিয়ে গেল যে, ভূতনাথ পর্যন্ত থাবা থেকে মুখ তুলে তাকাল। পাছে ওর অসমাপ্ত সেঞ্চুরির কথা মনে পড়ে যায়, তাই প্রায় ফিসফিস করে বললাম, "তোমাকে কেউ পড়তে বলে না ?"

"না," একেবারে অকপট স্বীকারোক্তি, "আমার ছোটবেলায় ম্যানিন, ম্যানিন, ওই যে কী বলে, খুব খারাপ জ্বর হয়েছিল, ডাক্তার বলেছিল পড়াশোনা করলে আমার মাথার অসুখ হবে, তাই আর পড়ি না।"

"মেনিনজাইটিস হয়েছিল ?"

"তাই হবে," অতি-বালক বলল, "গানের আগে নাচ শিখেছিলাম কিছুদিন। কিন্তু দোতলার লোকেরা গোলমাল করতে লাগল। বলল, ছাদ থেকে চুনের গুঁড়ো আর সিমেন্টের চাঙড় ভেঙে নাকি তাদের মাথায় পড়ছে। তাই বাবা বলল গান শিখতে। তা আগের মাস্টারমশাই অনেকদিন আসছে না। তাই তো বাবা তোমাকে ঠিক করেছে।"

মনে মনে বললাম, আমাকে কারুর বাবা গানের মাস্টার বানাতে পারবে না। আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার মা নেই।"

"সে তো আমার দু-বছর বয়েসে মরে গেছে। বাড়িতে শুধু আমি, বাবা আর পিসি।"

"পিসি কে ? যিনি আমায় দরজা খুলে দিলেন ?"

"হ্যাঁ, বাবার পিসি, আমিও পিসি বলে ডাকি।"

এবারে নিঃসন্দেহ হলাম। কোথাও একটা জব্বর ভুল হয়েছে। এ-তরুণ কখনও সে-তরুণ নয়। কিন্তু যে চক্রব্যূহে ঢুকেছি, তার বেরোবার পথে জয়দ্রথ দ্বারী হয়ে থাবা গেড়ে আছে সেঞ্চুরির যশোপ্রার্থী শ্রীল শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সারমেয় চূড়ামণি। পজিশানটাও নিয়েছে দরজার কাছে।

"তোমার নাম কী ?" অগত্যা জিজ্ঞাসা করলাম।

"ভীমভবানী মুখার্জি। বাবা ডাকে গামা, আর পিসি ডাকে গদাই বলে।"

"তোমার বাবা কুস্তি লড়েন ?"

"আগে লড়ত, এখন ব্যবসার কাজে সময় পায় না। তবে সকালে পঞ্চাশটা ডন আর একশো বৈঠক দেয়।"

ব্যস, হয়ে গেল। একে ভূতনাথ, তায় আবার তার প্রাক্তন কুস্তিগির মালিক। কথাটা ভাবতেই একটা হাত-পা-এলানো নিশ্চিন্তভাব এসে গেল। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পাশের বাড়িতে কে যেন দশজন লোকের হয়ে একাই হেঁচেছিল। তখন গ্রাহ্য করিনি।

"বুঝলাম," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "তোমার বাবার কিসের ব্যবসা ?"

"ভীম-মার্কা লোহার কড়াই আর বালতির। হাওড়ায় কারখানা আছে। কেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখোনি ?"

"দেখেছি নিশ্চয়।" বলতে বলতে মনে হল, এখনও পালিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু ভীম-মার্কা কড়াই আর বালতির কারখানার রোজ সকালে ডন-বৈঠক-করা পালোয়ান মালিক এসে পড়লে, সাঁড়াশি আক্রমণের সম্ভাবনা। তাই ধীরেসুস্থে ওঠার ভঙ্গি করে বললাম, "এবারে বাবা আমি কিন্তু উঠব। তুমি শ্রীল শ্রীযুক্ত ভূতনাথকে একটু সামলাও, আমার ওপর দিয়ে যাতে সেঞ্চুরিটা না করতে পারে। আমি বেরিয়ে যাই।"

"সে কী, আপনি আমাকে গান শেখাবেন না ?" অবাক হয়ে বলল সেই ভীমভবানী নামের বালক।

"না বাবা, আজ থাক," আমি মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, "গলাটা ধরে আছে, এর পরের দিন শেখাব। ধুতিটাও শুকিয়ে এসেছে। একটু ভিজে-ভিজে আছে, তা যেতে-যেতে শুকিয়ে যাবে। আজ চলি।"

এই বলে উঠেছিলাম। একটা প্রচণ্ড শব্দের গুঁতো খেয়ে বসে পড়লাম। সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরে আবার ভাঙা কাঁসার থালা গড়াতে লাগল, "মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব, বজ্জাত কোথাকার !"

ভূতনাথ, কী আশ্চর্য, দেখি লেজ নাড়ছে। শ্রীমান ভীমভবানী ওরফে গামা ওরফে গদাই গিয়ে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকলেন শ্রীমানের রাজ সংস্করণ। দু'হাতে দুটো ভর্তি বিশাল বাজারের থলি। কাংস্যকণ্ঠে অদৃশ্য অধিকারিণীকে বললেন, "পিসি, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না ! সেই কবে একটা ছোঁড়া কলিং বেল টিপে পালিয়েছিল, আর তুমি এখনও কেউ বেল টিপলেই চেঁচামেচি করো। আমি তো চাই ছোঁড়াটা ফের আসুক। আমার ভূতনাথের সেঞ্চুরিটা হয়ে যাক।"

"সেঞ্চুরি !" ফস করে কথাটা বেমক্কা বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে।

"হ্যাঁ, সেঞ্চুরি !" সেই বিশালদেহী কড়াই এবং বালতি কারখানার মালিক, যিনি তিন নম্বর তরুণ মুখোপাধ্যায় এবং যাঁকে আমি জীবনে দেখিনি, নিজের মনে বলে চললেন, "সেঞ্চুরিটা হলেই ভূতনাথের গলায় সোনার মেডেল, আর যার ওপর দিয়ে হবে, তার জন্যে ভূরিভোজ।" বলেই এতক্ষণে নজর পড়ল আমার ওপর। প্রশ্ন হল, "আপনি ?"

আমি চোখকান বুজে বললাম, "আমার নাম তরুণ মুখোপাধ্যায়। ভেবেছিলাম আমার ছোটবেলার বন্ধু, সহপাঠী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমারই নামের শরিক তরুণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি এসেছি। এখন দেখছি ভুল করে অচেনা অজানা তরুণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি, যেখানে শ্রীল শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সেঞ্চুরির অপেক্ষায় বসে আছেন। আপনাকে একান্ত অনুরোধ, আমাকে এই ভয়াবহ সৌভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা করুন। কারণ সেটা মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হবে। জীবনে একবার কুকুরের কামড় খাওয়াই যথেষ্ট। সে ব্যাপারটা আমার ছোটবেলাতে হয়ে গেছে, এমন-কী চোদ্দটা

ইঞ্জেকশান পর্যন্ত। এই বয়েসে ও ধকল আর সহ্য করতে পারব না।"

আমার কথা শুনতে শুনতে শালপ্রাংশু মহাভুজ তিন নম্বর তরুণ মুখোপাধ্যায়ের শিল্ডের মতো মস্ত মুখখানায় নানান ভাবের টানাপোড়েন। আমি থামতেই বাজারের থলে-দুটো মেঝেতে নামিয়ে হাসলেন হা-হা করে। বসে পড়লেন আর একটা চেয়ারে। তবু হাসির কামাই নেই। চোখে জল এসে পড়েছিল। মুছে নিয়ে বললেন, "আপনার বন্ধু উলটো দিকের ফ্ল্যাটে থাকেন। দরজায় টি কে মুখার্জি লেখা। তবে এখন আছেন বেলভিউয়ের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। গত শুক্রবার রাত্তিরে দু-নম্বর হার্ট অ্যাটাক। আমিই তো গাড়ি করে পৌঁছে দিলাম নার্সিংহোমে। কাল বিকেলেও খোঁজ নিয়েছিলাম। এখনো যমরাজার সঙ্গে কিতকিত খেলছেন। তবে মনে হয়, এ-যাত্রাও টিকে গেলেন।"

একটু থেমে বললেন, "যা স্বাস্থ্য, চোখে চশমা তো নয়, বোতলের তলার কাচ। কতবার বলেছি, মশাই, প্রাণ খুলে খাওয়াদাওয়া করুন, ডন-বৈঠক করুন, না দিনরাত ঘাড় গুঁজে বই পড়া। এখন বুঝুন ঠ্যালা।"

এই সুসমাচার শুনে নতুন করে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার। অতি কষ্টে একটু ভেংচিমার্কা হাসি মুখে লাগিয়ে বললাম, "বড় আনন্দ হল আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। এবার তাহলে চলি।"

"যাবেন কী মশাই," হাঁ-হাঁ করে উঠলেন পালোয়ান তরুণ মুখোপাধ্যায়। বললেন, "না হয় ভুল করেই এসে পড়েছেন, আঘাটায় তো পড়েননি। ছুটির দিন, রুই, ইলিশ, গলদা চিংড়ি —তা ছাড়াও এক নম্বর খাসির মাংস এনেছি। খেয়ে যান।"

"না, মাপ করুন। আমি আজ যাই।" বলে প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিলাম জোর করে। কপালগুণে পা পড়ল ভূতনাথের লেজে। অমনি ঘোঁয়াক করে একটা উদ্ভট শব্দ আর সঙ্গে-সঙ্গে গোড়ালির কাছে তীব্র যন্ত্রণা। আমি "ওরে বাবা রে, গেছি, গেছি" বলে চেঁচিয়ে উঠলাম।

"সেঞ্চুরি, ভূতনাথের সেঞ্চুরি!" আমার আর্তনাদ ছাপিয়ে বাপ-বেটার উল্লাস এবং উদ্দাম নৃত্য। তিন নম্বর তরুণ হুঙ্কার দিলেন, "গামা, ভূতনাথের মেডেল আর সেই সঙ্গে ডেটলের শিশি, তুলো নিয়ে আয়।"

তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আজ আমার বড় আনন্দের দিন।"

"আপনার তো আনন্দের দিন," আমি খিঁচিয়ে উঠে বললাম, "এদিকে আমাকে যে চোদ্দটা ইঞ্জেকশান নিতে হবে।"

"কিচ্ছু করতে হবে না আপনাকে," আমাকে জাপটে ধরে রেখে বললেন ভূতনাথের প্রভু, "ভুতুবাবুকেই আমি এক বছর অন্তর অ্যান্টির‍্যাবিস ইঞ্জেকশান দিই। আর ওর কামড় বড় পয়া, যাকে কামড়ায় তারই ভাল হয়। বেকার ছেলে ভূতনাথের কামড় খেয়ে চাকরি পেয়েছে, আর চাকুরে পেয়েছে প্রমোশন। আপনারও ভালই হবে দেখবেন। আপনাকে না খাইয়ে ছাড়লে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে। না, না, আপনার কোনো ওজর-আপত্তি আমি শুনব না।"

ভূতনাথও ভৌ-ভৌ করে ডেকে তার মনিবের প্রস্তাব সমর্থন করল।

ছবি : দেবাশিস দেব

তিন তার্কিক

সাধনা মুখোপাধ্যায়

গান নিয়ে চলে ঝগড়া বেজায়
তর্ক অহর্নিশি,
তিন-তিনজন তিন তার্কিক
মা, ঠাকুমা, আর পিসি।

পিসি পপ্ সঙ,
মার আধুনিক,
ঠামার টপ্পা চাই,
সবার লক্ষ্য
নিজের পক্ষ,
কারোর জিরেন নাই।

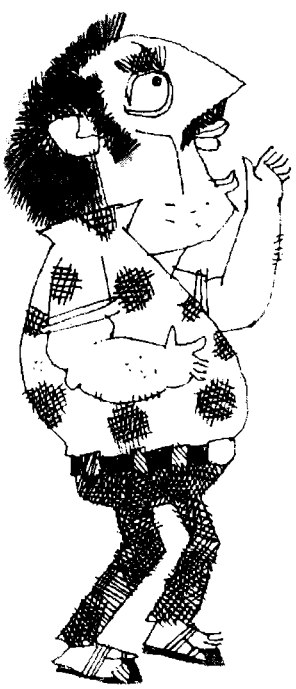

শব্দে-পাগল জনসাধারণ,
শিশু ও কিশোর কোন্ ছার,
বাবা কানে হাত
দিয়ে বললেন,
"এ কেমন ঘর-সংসার!"

বিরু বড় বীর
সরিয়ে সে ভিড়
শুনল অন্ত আদ্য,
গায়ে জোর তার
চার-চারবার
খায় ঘৃত ছাগলাদ্য।

তার ভাই রামা
আনল দামামা
বাজাল ভীষণ বাদ্যি,
পিসি, মা ও ঠামা
বলে, "ওরে থামা,
আজ থেকে গান বাদ দি।"

ছবি : দেবাশিস দেব

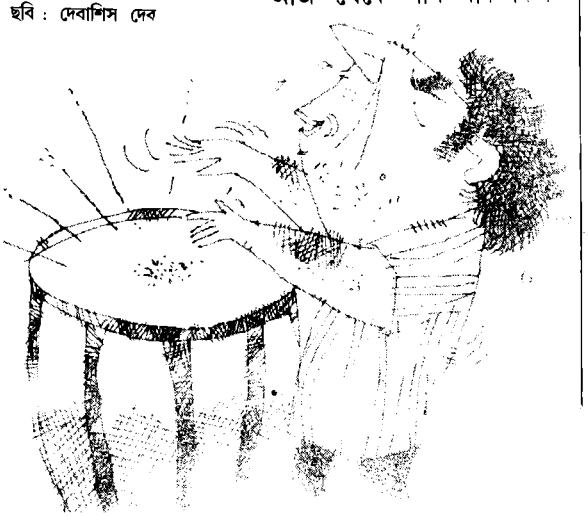

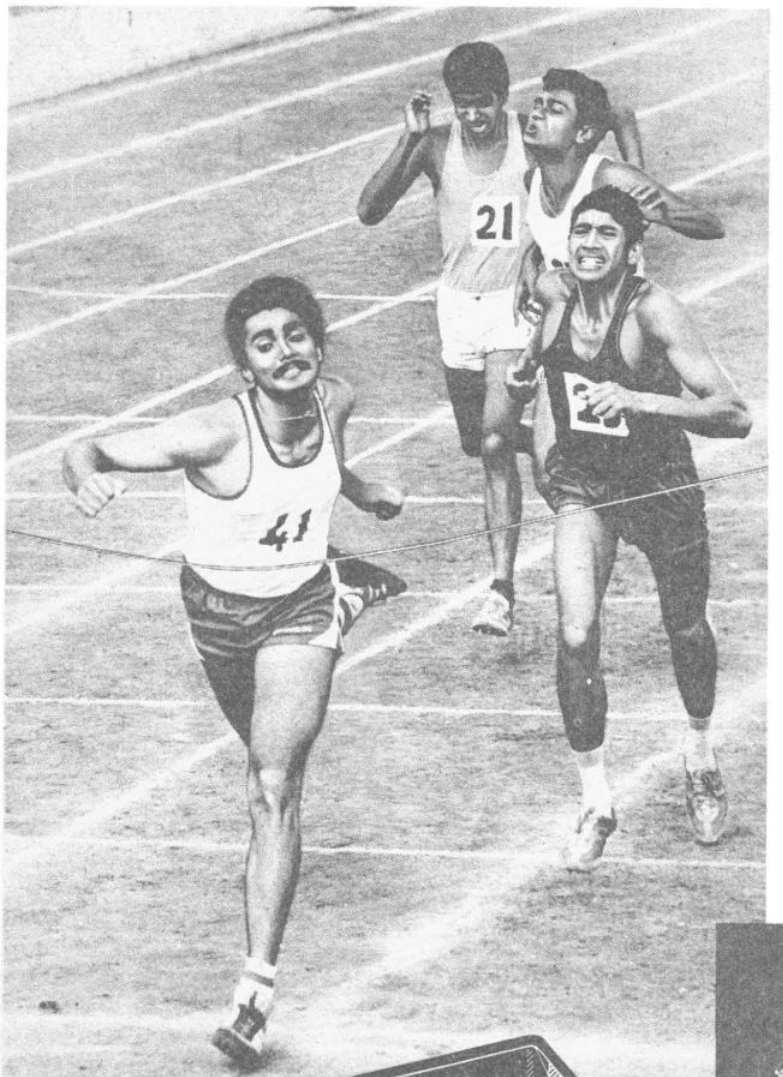

লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয়—স্বাস্থ্যেরই নাম। সারাদিন ধরে খাটুনীর পরে ... কিম্বা প্রচণ্ড হুটোপাটি করে খেলার মজার পরে, লাইফবয় দিয়ে স্নানের মজাই আলাদা! এ আবার আপনার মাঝে জাগিয়ে তোলে—এক সাফ আর সুস্থ অনুভূতি!

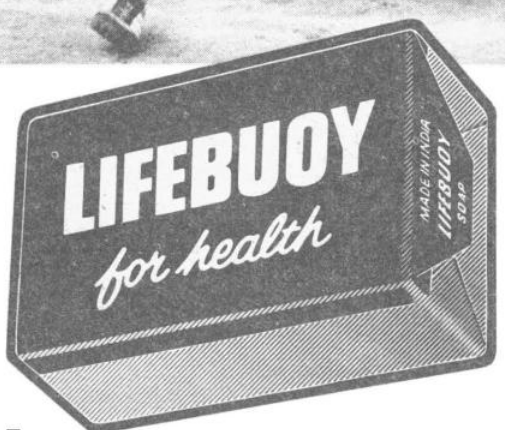

লাইফবয় ধূলোময়লার রোগজীবাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS L 88 2116 BG

ভূতেরা সর্বদাই থাকে

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

সেদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই দেখি ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। বারান্দায় এসে দেখি, ওমা, পথে এখনই হাঁটু-জল।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বাবা বললেন, "আকাশের যা অবস্থা বৃষ্টি সহজে থামবে বলে মনে হয় না। খবরের কাগজওলা কাগজ দিতে এসে বলল, ট্রাম বাস সব বন্ধ।"

আমি বললাম, "ভালই হল, বাবা, আজ আর অফিস যেয়ো না।"

এরকম বৃষ্টিতে আমার বা অন্য ভাইবোনদের স্কুলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে হঠাৎ করে বিনা নোটিসে এরকম ছুটি পেলে মনে একটা 'কী করি কী করি' ভাব জাগে অবশ্য, কিন্তু আজ সে-বিষয়ে চিন্তা নেই, কারণ গত রাত্রে ছোটমামা এসেছেন।

আমার ছোটমামা একটু ভবঘুরে প্রকৃতির। বিয়ে-থা করেননি। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে পারেন না। চাকরির পর চাকরি পালটান। আর সে-সব চাকরি অধিকাংশই কলকাতার বাইরে। ফলে ভারতের অনেক জায়গাই দেখা হয়ে গেছে ছোটমামার। দাদামশায়ের রেখে যাওয়া পৈতৃক বাড়িটায় ছোটমামার অংশের ঘর দুটোয় প্রায়ই তালা ঝোলে। আত্মীয়স্বজনের প্রতি খুব একটা টান নেই ছোটমামার, তবে ছোড়দি, অর্থাৎ আমার মা'কে খুব ভালবাসেন।

কিন্তু আমরা ছোটরা ছোটমামাকে ভালবাসি অন্য কারণে। ছোটমামার ঝুলিতে অনেক গল্প রয়েছে। গল্প বলতে খুব ভালও বাসেন।

কাজেই বৃষ্টির জন্য বাড়ি থাকতে হলেও সময়টা ভালই কাটানো যাবে মনে হল। প্রথমটা একটু গাঁইগুঁই করলেও পরে ছোটমামা ঠিকই বলবেন গল্প। অতগুলো ভাগনে-ভাগনির (আমাদের বিল্ডিংয়ের অন্যান্য ফ্ল্যাটেও ছোটমামার পাতানো ভাগনে-ভাগনির অভাব নেই) অনুরোধ ঠেলা কি সহজ কথা ? অবশ্য আমার মা-বাবাও ছোটমামার গল্পের আসরে যোগ দিয়ে ফেলেন মাঝে-মাঝে।

বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে। সবারই আজ ঘরবন্দী অবস্থা। বাইরের ঘরে মাদুর পেতে ছোটরা সবাই বসলাম। ছোটমামা সোফায় হেলান দিয়ে, বাবা পাশের চেয়ারে। আমাকে ডেকে বাবা বললেন, "বুলি, তোমার মা'কে ডেকে আনো, বিরু গল্প বলবে।"

মা এদিকেই আসছিলেন। বললেন, "আজ তো আর বাজার-টাজার হবে না—লক্ষ্মীর মা'কে খিচুড়ি আর আলুভাজা করতে দিই ?"

মামা বললেন, "ছোড়দি, ওই সঙ্গে খান কয়েক ফোলা-ফোলা ডিমের বড়া করতে বল্ না !" হিল্লি-দিল্লি ঘুরলেও ছোটমামা এখনও 'ডিমের বড়া'র লোভ ছাড়তে পারেননি।

মা হেসে বললেন, "হবে। বলে আসছি। কিন্তু তুই গল্প শুরু করে ফেলিস না যেন।"

একটু বাদেই মা ফিরে এলেন। ছোটমামা এবার গল্প শুরু করবেন। আমি বললাম, "ছোটমামা, ভূতের গল্প বলো, বৃষ্টি-বাদলার দিনে ভূতের গল্প জমে ভাল।"

আমার ছোট ভাই পল্টু বলে উঠল, "যাঃ, দিনের বেলায় ভূতের গল্প জমে নাকি ?"

ছোটমামা কিন্তু আমার কথায় সায় দিলেন। বললেন, "তা কেন? দিনের বেলায় ভূতেরা উবে যায় নাকি যে, গল্প জমবে না? ইন ফ্যাক্ট, ভূতেরা সব সময়ই আমাদের চারদিকে আছে, রাতে এবং দিনে।"

বাবা প্রশ্ন করলেন, "বিরু, তুমি কি কখনও দিনের বেলায় ভূত দেখেছ?"

"নিশ্চয়ই," বললেন ছোটমামা, "সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছি।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোন্ তাহলে।... আমি তখন আমেদাবাদে। চায়ের কোম্পানির এজেন্সি ছেড়ে এক ওষুধের কোম্পানির এজেন্সি ধরেছি। নিজের স্কুটার চালিয়ে শুধু আমেদাবাদ নয়, আশেপাশের ছোট-ছোট জায়গাতেও হানা দিচ্ছি অর্ডারের জন্য। সেই সূত্রেই রণছোড়ভাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ। আমেদাবাদের কয়েক মাইল দূরে সরখেজ বলে একটা ছোট শহর আছে। সেই সরখেজ শহরেই থাকতেন রণছোড়ভাই। নানা ব্যবসা ছিল ওঁর। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওষুধের দোকান চালানো। ঐ দোকানে ওষুধের অর্ডার নিতে গিয়েই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। দেখলাম, আর পাঁচটা ব্যবসায়ীর মতো রণছোড়ভাই শুধু টাকা আনা পাইয়ের হিসেব নিয়েই থাকেন না। কলেজি শিক্ষা ওঁর কতদূর আছে জানতে পারিনি, তবে নানা বিষয়ে ঝোঁক আছে ওঁর। সে-সময়টা আমি আবার পরলোকতত্ত্ব, আত্মা, প্ল্যানচেট এইসব নিয়ে একটু পড়াশোনা করছিলাম। দেখলাম, রণছোড়ভাইয়েরও এসব বিষয়ে খুব ইন্টারেস্ট। আলাপ-আলোচনা আমাদের তাই ভালই জমত। বলা বাহুল্য, কাজ ছাড়াও ছুটির দিনে প্রায়ই ওখানে যেতাম আমি। ওখানে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে গুজরাতি দোলনায় বসে পান চিবুতে-চিবুতে আলোচনা করতাম যত রাজ্যের ভূতপ্রেত নিয়ে।

"এখানে বলে রাখি যে, টাকাপয়সা ইত্যাদির ব্যাপারে রণছোড়ভাইয়ের যতই সুখ থাকুক না কেন, এক ব্যাপারে খুব অশান্তি ছিল ওঁর। রণছোড়ভাইয়ের স্ত্রী হংসাবেন ছিলেন একটি রীতিমত দজ্জাল মহিলা। সর্বদাই যুদ্ধং দেহি ভাব—জিভের ডগায় তরোয়ালের ধার। বেচারা রণছোড়ভাই ওঁর ভয়ে সর্বদা কেঁচো হয়ে থাকতেন। তবে কী সুগ্রহের ফলে জানি না হংসাবেন আমার প্রতি কিছুটা সদয় ছিলেন; নয়তো, সত্যি কথা বলতে কী, সরখেজে ওঁদের বাড়ি অত ঘন-ঘন যাবার সাহসই হত না আমার। কিন্তু আমাকে কিছু না বললেও প্রয়োজনবোধে আমাকে সামনে রেখেই রণছোড়ভাইয়ের বাপান্ত করে ছাড়তেন। রণছোড়ভাই প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন, বিরুভাই, এই ওয়াইফের জন্য আমার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল!"

এই পর্যন্ত বলে থামলেন ছোটমামা। মা'কে বললেন "একটু চা হলে ভাল হত ছোড়দি।"

মা আমাকে বললেন, "বুলি, লক্ষ্মীর মা'কে চায়ের জন্য বলে আয় তো।"

আমি বললাম, "যাচ্ছি। কিন্তু ছোটমামা, তুমি ভূতের গল্প বলবে বলছিলে। এ-গল্পে ভূত কোথায়?"

ছোটমামা একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "দাঁড়া, সময় হলেই আসবে।"

গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ছোটমামা ফের গল্প শুরু করলেন। "যা বলছিলাম। হংসাবেনের দাপটে রণছোড়ভাইয়ের কাহিল অবস্থা দেখে সত্যি কষ্ট হত আমার। একদিন বললাম, 'রণছোড়ভাই, কী করে যে এত কষ্ট সহ্য করো বুঝি না।'

"দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন রণছোড়ভাই, 'ভাই, সাতফেরা দিয়ে যখন ঘরে তুলেছি, তখন এ-বন্ধন আর এ-জন্মে কাটানো যাবে না। তবে মাঝে-মাঝে যদি এক-আধটু ছাড়ান পেতাম!'

"আমি বললাম, 'ভাবীকে দিনকয়েকের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও না!'

"'বাপের বাড়ি? সে গুড়ে বালি। ওদিকে কেউ নেই ওর। তীর্থে যেতে চাইলেও সঙ্গ ছাড়ে না। আমায় কোথাও একা পাঠিয়ে নাকি ওর ঘুম হয় না। মনে হয়, এক আধ বেলাও যদি নিজের করে পেতাম।'

"বললাম, 'দাঁড়াও, ভেবে একটা উপায় বার করবই।'

"এর কিছুদিন পরের কথা। সেই রবিবারেও সরখেজ গেছি। খাওয়া-দাওয়ার পর যথারীতি রণছোড়ভাই আর আমি পান চিবুতে-চিবুতে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছি। হংসাবেন কাছেই ছোট একটা টুলে বসে কারুকার্য-করা জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটছেন ও মাঝে-মাঝে রণছোড়ভাই-এর উদ্দেশে হুল-ফোটানো মন্তব্য করছেন। আমরা অবশ্য ইচ্ছে করেই ভূতপ্রেত নিয়ে কথা বলছিলাম যাতে হংসাবেন বিরক্ত হয়ে উঠে যান। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। উনি ঠিকই বসে রইলেন।

"বিষয়টায় আমাদের ইন্টারেস্ট থাকায় ক্রমশ আলোচনায় মশগুল হয়ে গেলাম। সেদিন আমাদের তর্কটা হচ্ছিল এই নিয়ে যে, ভূতেরা আত্মপ্রকাশের জন্য পরিবেশের ওপর নির্ভর করে কি না। সোজা কথায়, দিনের বেলায় সাদা চোখে ভূত দেখা যায় কি? না ভূত দেখতে হলে রাতের অন্ধকার, গা ছমছম করানো পরিবেশ চাই? রণছোড়ভাইয়ের মতে আত্মা আছে, তাই আমরা অর্থাৎ মানুষেরা যেমন আছি, তেমনি ভূতেরাও আছে। আমরা যদি দিনের আলোয় চলাফেরা করতে পারি, তবে ভূতেরা পারবে না কেন?

"আমি সে-কথা মানতে পারলাম না। বললাম, 'দিনের আলোয় ভূত দেখা যায় না এটা সবাই জানে। আঁধারে আমরা ভয় পাই, আর ভূতেরা ভয় পায় দিনের আলো।' কিন্তু রণছোড়ভাইয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, ভূতপ্রেতেরা দিনের বেলাতেও দেখা দিতে কসুর করে না।"

"তর্ক করতে-করতে এমনি মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে, হংসাবেনের দিকে আর তাকাইনি। হঠাৎ ওদিকে ফিরে দেখি, উনি বেশ কটমট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। অর্থাৎ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু একদম পছন্দ হচ্ছে না ওঁর।

"হঠাৎ মাথায় একটা মতলব এল। রণছোড়ভাইকে বললাম, 'তোমার কথা মানতে পারছি না। দিনের বেলা মোটেই ভূত দেখা যায় না। এ-বিষয়েই একটা বই পড়েছিলাম মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরিতে। চাও তো গিয়ে পড়ে আসতে পারো।'

"'মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরিতে?' রণছোড়ভাইকে বেশ অবাক দেখাল।

"আমি অবশ্য জানি যে, সে-রকম কোনো বই

মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরিতে নেই। চোট টিপে রণছোড়ভাইকে ইংগিতও দিলাম একটা। তারপর বললাম, 'বুধবার এসো আমার ওখানে। দুজনে মিলে লাইব্রেরিতে ঘণ্টা দু' তিন কাটিয়ে পুরো বইটা পড়ে ফেলা যাবে।'

"ততক্ষণে রণছোড়ভাইও আমার আসল উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেলেছেন। তা হচ্ছে হংসাবেনের খবরদারি থেকে অল্পক্ষণের ছাড়ান পাওয়া। বেশ উৎফুল্ল গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, বেলা বারোটা নাগাদ তোমার ডেরায় পৌঁছে যাব। কী বলো ?'

"কিন্তু আমাদের উৎসাহের আগুন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে হংসাবেন বলে বসলেন যে, ওঁরও কিছু শাড়ি কাপড় কেনার আছে, অতএব উনিও আমেদাবাদে যাবেন সেদিন। বাসে না গিয়ে রণছোড়ভাই ওদের পুরনো অ্যামবাস্যাডারখানা নিয়ে দিব্যি যেতে পারবেন।

"রণছোড়ভাইয়ের মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিলে।

"আমি কিন্তু অত সহজে হারবার পাত্র নই। মিষ্টি হেসে বললাম, 'তা যাবেন বই কী ভাবীজি, নিশ্চয়ই যাবেন। তবে মেয়েদের বাজার করতে তো একটু সময় লাগে, মানে দেখে শুনে কিনতে হবে তো! আমি বলি কী, রণছোড়ভাই আপনাকে নিউ ক্লথ মার্কেটে নামিয়ে দিয়ে লাইব্রেরির ব্যাপারটা সেরে নেবেন, আর ঘণ্টা দুই পর আপনাকে তুলে নেবেন ওখান থেকে। তারপর অধমের ডেরায় একটু চা-টা খেয়ে বাড়ির পথ ধরবেন, কী বলেন ?'

"হংসাবেন রাজী হয়ে গেলেন। পরের বুধবারের প্রোগ্রাম করা হল।

"সেদিন চলে আসার আগে হংসাবেনের কান বাঁচিয়ে রণছোড়ভাই আমায় বললেন, 'বিরুভাই, তোমার উপস্থিত-বুদ্ধির জন্য ধন্যবাদ। অন্তত ঘণ্টা দুয়েক তো একটু শান্তি পাব। তবে যে বইয়ের কথা বললে, সে-রকম কোনো বই আছে নাকি লাইব্রেরিতে ?'

"আমি বললাম, 'যদ্দুর জানি নেই। তবে বইটই পড়তে আমরা যাচ্ছি না। দুটো ঘণ্টা একটু ফূর্তি করা যাবে। ঠিক বারোটায় আমার ডেরায় চলে এসো।'

"রণছোড়ভাই মহা উৎসাহে বললেন, 'ঠিক আছে, বারোটায় পৌঁছে যাব।'

"পরের বুধবারে আমি তাড়াতাড়ি স্টোভে সেদ্ধভাত রান্না করে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাখলাম। যদ্দুর মনে হয় রণছোড়ভাই ঠিক বারোটাতেই এসে হাজির হবেন—কারণ উনি নিজে একটু ঢিলেঢালা গোছের হলেও হংসাবেন এসব ব্যাপারে খুব কড়া।

"কিন্তু আমি বারোটার অল্প আগে থাকতেই তৈরি হয়ে থাকলেও রণছোড়ভাইয়ের দেখা নেই। বারোটা বাজল, সওয়া বারো, সাড়ে বারো, ঘড়ির কাঁটা এগিয়েই চলেছে। এত দেরি কেন হচ্ছে বুঝতে পারলাম না। আমার ডেরায় ফোন নেই, তাই ফোন করতেও পারলাম না। বাইরে কোথাও বেরিয়ে যে ফোন করব, তারও উপায় নেই, পাছে রণছোড়ভাই এসে ঘর বন্ধ দেখে ফিরে যান!

"একটা বাজতে চলল, তখনও ওঁর পাত্তা নেই দেখে একটু ভাবনায় পড়লাম। তবে কি ওঁরা আসবেন না ? হংসাবেন কি মত পাল্টেছেন ? অবশ্য ওঁর যা মতিগতি, মত পাল্টানো কিছুই অসম্ভব নয়। হয়তো আমাদের আসল মতলবটাও ধরে ফেলেছেন। মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরিতে ফোন করে ঐ ধরনের কোনো বই নেই সেখানে, তা জেনে ফেলাও বিচিত্র নয়। হংসাবেন সবই পারেন।

"সওয়া একটা নাগাদ ওঁদের আসার আশা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করছি, এমন সময় আমার কলিংবেল বেজে উঠল।

"দরজা খুলে দেখি রণছোড়ভাই একা নন, সঙ্গে হংসাবেনও আছেন। অর্থাৎ আমাদের আসল প্ল্যান ভেস্তে গেল।

"ওঁরা ভেতরে এলেন, কিন্তু বসলেন না। আমি রণছোড়ভাইকে বললাম, 'কী ব্যাপার, এত দেরি যে ?' তারপর হংসাবেনকে বললাম, 'ভাবীজি কি মার্কেটে যাননি ? শাড়ি কেনার কী হল ?'

"হংসাবেন মাথা নাড়লেন শুধু। ওঁকে বড্ড গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

"রণছোড়ভাই বললেন, 'তোমার ভাবীর আর কেনাকাটার দরকার হবে না। তবে যা বলতে এসেছি, তোমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে যাওয়া হবে না আর।'

"বললাম, 'তা তো বুঝতেই পারছি। তবে আজ না হলেও সামনের সপ্তাহে কোনো-একটা দিন ঠিক করা যাবে। ভাবীজি নাহয় ওঁর মার্কেটিং সেদিনই করে নেবেন।'

"রণছোড়ভাই ম্লান মুখে বললেন, 'তুমি বুঝতে পারছ না বিরুভাই, তোমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে সামনের সপ্তাহে কেন, কোনোদিনই আর যাওয়া হবে না। তোমার ভাবীজিকে না নিয়ে এক পা যাওয়ার সাধ্য রইল না আমার। সাতফেরার গাঁটছড়াটা আর খোলা যাবে না।'

"অবাক হয়ে বললাম, 'তোমার কথা বুঝতে পারলাম না রণছোড়ভাই।'

"'দিচ্ছি বুঝিয়ে। কিন্তু তার আগে বলো, আমাদের তর্কের বিষয়টা মনে আছে কি না—'

"'নিশ্চয়ই আছে। আমি বলেছিলাম যে, দিনের আলোয় ভূতেরা দেখা দিতে পারে না। তুমি বলেছিলে, পারে।'

"'হ্যাঁ, পারে। তারই প্রমাণ দিয়ে গেলাম।'

"'বুঝলাম না রণছোড়ভাই।'

"হঠাৎ আমার ঘরের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া খেলে গেল। গা'টা কেমন শিরশির করে উঠল। রণছোড়ভাই কেমন যেন হিসহিস করে বললেন, 'এগারোটা নাগাদ সরখেজ থেকে রওনা হয়েছিলাম আমরা। সেই পুরনো অ্যামবাস্যাডারখানায়। হাইওয়েতে পড়েই একটা ট্রাকের সঙ্গে হেড-অন কলিশন। হ্যাঁ, আমি ও তোমার ভাবীজি একসঙ্গেই এ-পারে চলে এসেছি। এখন বুঝলে তো কেন বলছি ভূতেরা দিনের আলোতেও দেখা দিতে পারে ?'

"কথাটা শেষ করেই শূন্যে মিলিয়ে গেলেন রণছোড়ভাই ও হংসাবেন। আর আমি কেমন যেন বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম।"

ছোটমামা গল্প শেষ করলেন। বাইরে তখনও ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

ছবি : প্রবীর সেন

ধাঁধা

পুজোর ছুটিতে কত লোক যে বাইরে যায়, তার হিসেব নেই। শুধু ট্রেনে চেপে গেলে তবু যাহোক একটা হিসেব মিলত, কিন্তু প্লেনে-ট্রেনে-বাসে এমন-কি নিজেদের গাড়িতেও যেহেতু লোক বেরিয়ে পড়ে, তাই সঠিক হিসেব পাওয়া কঠিন।

সেদিন ছোট্কার ঘরে বসে এই বাইরে যাওয়া নিয়েই কথা হচ্ছিল। ছোট্কাই বলছিল, আমরা শুনছিলাম। আমরা মানে, আমি, ছোড়দি, আর গৌরী—আমার মামাতো বোন। এক সময় গৌরী বলল, "যারা বাইরে যায়, তাদের যেমন হিসেব নেই, তেমনি যারা তোমাদের কলকাতার জ্যামে আটকে ট্রেন ফেল করে তাদেরও সংখ্যা বড় কম নয়। তাদের হিসেবই বা কে রাখছে ?"

"তা সত্যি।" ছোট্কা গৌরীর কথায় সায় দিয়ে বলল, "এই তো এবার পুজোতেই আমার চেনা দু-দুটো পরিবার জ্যামে আটকে ট্রেন ফেল করল।"

সেদিন সকালের এই আলোচনা থেকেই বোধহয় ছোট্কা এবারের নতুন ধাঁধাটা তৈরি করেছে। ছোট্কার দেওয়া সেই ধাঁধাটাই দিচ্ছি প্রথমে। দ্যাখো তো, চট কর উত্তরটা করে ফেলতে পারো কি না।

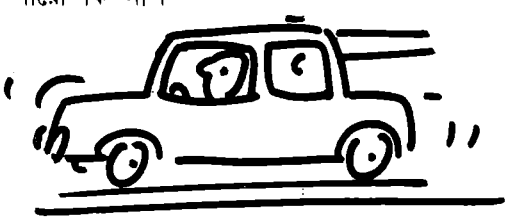

প্রথম ধাঁধা ।। ফেলুচরণবাবু মোটরগাড়ি চেপে ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন। দু-মাইল পথ তাঁকে আরো যেতে হবে যখন তখন ঘড়িতে দেখলেন ট্রেন ছাড়তে ঠিক দু-মিনিট সময় বাকি।

ফেলুচরণবাবুর মোটরগাড়ি যদি প্রথম মাইলটা যায় ঘন্টায় তিরিশ মাইল স্পিডে, তাহলে দ্বিতীয় মাইলের জন্য ঘন্টায় কত মাইল স্পিডে তাঁর গাড়িটাকে যেতে হবে, যাতে কিনা ট্রেনটা ধরতে পারেন ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ।। একটা হাঁসের সামনে দু-দুটো হাঁস, একটা হাঁসের পিছনে দু-দুটো হাঁস, দু-দুটো হাঁসের মধ্যিখানে একটা হাঁস—একটা পুকুরে কম পক্ষে কটা হাঁস থাকলে এমন একটা দৃশ্য তৈরি হতে পারে ?

তৃতীয় ধাঁধা ।। একজন চাষির ঘরে ১৭টা মুরগি ছিল। ন'টা বাদে বাকিগুলো মরে গেল। খুব তাড়াতাড়ি বলো তো, কটা রইল ?

গতবারের উত্তর ।। (১) দশ জন। (২) দুজনকে নিয়ে একবারে যাওয়াতেই লাভ বেশি। কেননা, তোমাকে ধরে কাটতে হচ্ছে তিনটে টিকিট। কিন্তু দু-বার দু-বন্ধুকে নিয়ে গেলে তোমার টিকিট লাগছে দু-বার, অর্থাৎ চারটে টিকিট কাটতে হচ্ছে তোমাকে। (৩) এক ঘন্টা।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১	২		■	৩	৪	
■		■	■			■
৫		৬	■	৭		৮
	■	৯			■	
১০	১১		■	১২	১৩	
■		■	■			■
১৪						

সংকেত : পাশাপাশি : (১) সূর্যবংশের কুলগুরু। (৩) পঞ্চনদের একটি। (৫) শৌখিন চাদর। (৭) কৃষকরা শস্যবীজ নিয়ে কী করেন ? (৯) বাঘ। (১০) যা দিয়ে বাতাস করা হয়। (১২) হাতে পরার পোশাক। (১৪) সাত অক্ষরের অর্থহীন শব্দ, তবে দ্বিতীয়ে-তৃতীয়ে ও পঞ্চমে-ষষ্ঠে ঘর-বদলাবদলি করিয়ে এমন একটা শব্দ পাবে যার অর্থ—পাঁচমিশেলি।

উপর-নীচ : (২) এক মুঘল-সম্রাট যাঁকে 'পার্বত্য মূষিক' বলতেন। (৪) পা দিয়ে পান করে যে। (৫) গঙ্গার আর-এক নাম। (৬) বধ্যভূমি। (৭) চোখ-বাঁধা অবস্থায় ঘানি টানে। (৮) উদাহরণ। (১১) শেয়াল। (১৩) যে গুণ গায় বা খোশামোদ করে।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

কু	মি	র	■	সি	ং	হ
কু	■	■	■	■	■	রি
র	■	জি	■	ক্র	■	ণ
■	ব	রা	■	মে	ড়া	■
তু	■	ফ	■	ল	■	ক্যা
র	■	■	■	■	■	ঙা
গ	ণ্ডা	র	■	শ	জা	রু

মজার খেলা

ন'টা টুথপিক কিংবা ন'টা দেশলাইকাঠি নিয়ে এবারের মজার খেলা। তাই কাঠিগুলো যোগাড় করে ফেলো।

করেছ ? বেশ। এবার টেবিলের ওপর নীচের ছবির মতন করে সাজাও—

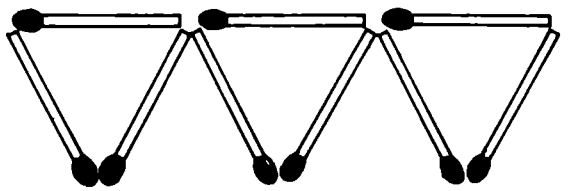

সাজিয়েছ ? ব্যস, এবার বন্ধুদের ডাকো। তাদের বলো, তিনটে কাঠিকে তুলে নিয়ে ফের এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে কিনা টেবিলে দেখা যায় মোট পাঁচটা ত্রিভুজ। সমান মাপের ত্রিভুজ বলে ফেলো না যেন। কেননা, পাঁচটা ত্রিভুজ এক মাপের হবে না।

কেন হবে না, জানতে চাইছ ? বলব, কিন্তু তোমার নিজের বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করে ফেলার পর। আর, তুমি যদি সমাধান নিজেই করে থাকো, তবে তার চেহারাটা নিশ্চয়ই এইরকম—

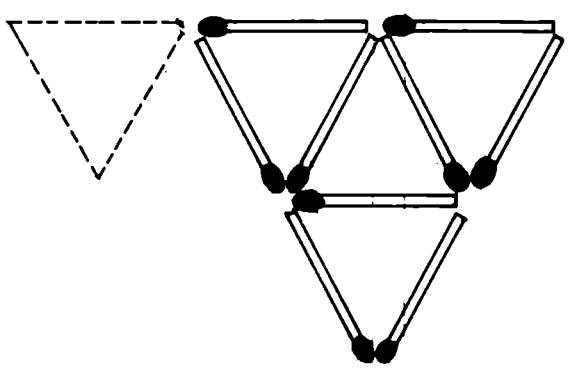

অর্থাৎ, বাঁ দিকের ত্রিভুজটা পুরো উঠে এসে বাকি দুটোর তলায় বসবে। তাহলেই দেখবে, চারটে এক মাপের ও সব মিলিয়ে একটা বড় মাপের—এই মোট পাঁচটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে।

মজারু

উত্তর বটে

প্রঃ আপনি দাবি করছেন, এমন একটা রাসায়নিক পদার্থ আপনি আবিষ্কার করেছেন, যা যে-কোনো কঠিন জিনিসকেই গলিয়ে দেবে। বিজ্ঞানীদের ডেকে পদার্থটা দেখিয়ে দিচ্ছেন না কেন ?

উঃ ওটা রাখব কিসের মধ্যে যে দেখাব !

প্রঃ আপনি আপনার ছেলের দাঁত-দিয়ে-নখ-কাটা বন্ধ করেছেন বলছেন, কী করে পারলেন ?

উঃ দিয়েছি ওর দাঁতগুলো ফেলে।

প্রঃ তিনজন স্পেশালিস্ট বলেছেন রুগি মারা গেছে লিভার শুকিয়ে যাবার ফলে, আর তুমি সেদিনকার পাশ-করা ছোকরা, তুমি বলছ লিভার বড় হয়ে গিয়েছিল, তুমি জানলে কী করে হে ?

উঃ আমি যে পোস্ট-মর্টেম করে এলাম।

সুসেন

হাসিখুশি

"মহকুমার এস·ডি·ও· বিরক্ত হয়ে আসামিকে বললেন, "আমার এই দীর্ঘ চাকরি-জীবনে তোমাকে অন্তত কুড়িবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেখলাম। লজ্জা করে না তোমার ?"

বিনীতভাবে জবাব দিল আসামি, "এতদিনেও যে আপনার পদোন্নতি হয়নি, সেটাও কি আমার অপরাধ হুজুর ?"

"পকেট একেবারে ফাঁকা। অথচ দোকানে 'আজ নগদ কাল ধার' নোটিশ টাঙিয়েছে দোকানদার। একটা উপায় বাতলে দিতে পারেন ?

"আজকের দিনটা কোনোরকমে চালিয়ে নিয়ে কাল ধার নিলেই হল।"

"বইগুলোকে অমন পাহাড়ের মতো সাজিয়ে রেখেছেন কেন ?"

"ওগুলো যে মাউন্টেনিয়ারিংয়ের বই স্যার।"

টানা তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করবার পর বক্তা শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?"

একজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "হ্যাঁ, বলুন তো এখন ক'টা বাজে ?"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

টিনটিন

ব্যাটা পাজি !
ফুউউশ
ছাতা কোথায় ! আমার ছাতা !
আমার ছাতা !
ক্যাপ্টেন এখনও আসেনি !
আসছি !
টিনটিনকে ওরা জখম করে পালিয়েছে !
পাজি! গণ্ডার! হিপোপটেমাস !
ফুউউশ
এখানে থাকা নিরাপদ নয় ! অন্য দল এসে পড়বে !
লুকিয়ে পড়ো !
ওই ওরা ! এই ফাঁকে...
প্রোফেসরকে নিয়ে সিলডাভিয়ানরা সরে পড়েছে !
হেলিকপটারে ওদের পিছু নেওয়া যাক !
ঠিক বলেছ !
হেলিকপটার না-পেয়ে ওরা পাগল হয়ে যাবে !

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
রোভার্সের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা অসুস্থ। ভাঙা টিম, হেকলাভিকের কাছে হেরে আইসল্যাণ্ড থেকে দেশে ফিরেছে···
রয় ! রয় !
রোভার্স স্টেডিয়াম
রোভার্স ! রোভার্স !
আমরা তোমার ভক্ত !
কারণটা কী ?
অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে !
এই আবহাওয়ায় !
অথচ আমরা হেরে ফিরছি !
টিভিতে খেলা দেখেছি ! কপাল খারাপ না হলে···
আমরাই জিততুম !
ধন্যবাদ ! সব্বাইকে ধন্যবাদ !
কিন্তু আমাদের ধারণা, তুমি অতি বাজে খেলোয়াড় !
ঠিক কথা !
এরা আবার কারা ?
বাজে টিমের কাছে তোমরা হেরেছ !
দুয়ো ! দুয়ো !
কে ওরা, বুঝেছি !
মেলবরোর সমর্থক !
মেল নদীর দুই তীরে দুই শহর : মেলচেস্টার আর মেলবরো···
তোমরা মেলবরোর সমর্থক !
তাতে হয়েছেটা কী ?
কিচ্ছু হয়নি। শিগগিরই তোমাদের মুখোমুখি হব !
তখন আমরা তোমাদের গো-হার হারাব !

তখনই বরং দুয়ো দিও, কেমন ?
দেবই তো !
হাহা !
যাক, ওরা চলে যাচ্ছে !
কী ভাবছ রয় ?
ভাবছি যে, কিছুদিনের মধ্যেই...
এফ· এ· কাপের ফিফথ রাউণ্ডে ওদের সঙ্গে খেলা পড়বে । তখন ওরা দারুণ লড়বে মনে হচ্ছে !
দু'দিন বাদে··· রয় এসে স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুমে ঢুকতেই···
রয়, মেলবরোর ম্যানেজার জ্যাকসন একটা বেতার-বৈঠকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় ।
তার মানে একটা ঝগড়া বাধাবার ইচ্ছে !
আমি এতে রাজি নই ! না, কথা বলব না!
PRACTICE PITCH
সে তুমি যা ভাল বোঝো !
মেলচেস্টার রোভার্সে সবাই এখন সুস্থ···
আরে, প্যাকো !···মার্ভিন ! যাক, আর কোনো গণ্ডগোল নেই তো ?
না, না, আমরা একদম ফিট্ !
ভার্নন আর চার্লিও সুস্থ !
ভিক্ গাথরিও আগের মতো খেলছে !
বাঃ ! বাঃ !
ঠিক তখনই নদীর ওপারে মেলবরোর মাঠে···
রয় তাহলে বিতর্কে যোগ দেবে না ? ঠিক আছে !
এখন কী করবে জ্যাকসন ?
শিগগিরই জানতে পারবে ! রয়ের মনোবল আমি ভেঙে দিতে চাই !
মনোবল কি ভাঙা যাবে ?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

বোর্নভিটাভরা বর্ষগুলি

যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে তাদের কৃতজ্ঞতা।

বাড়ন্ত বাচ্চারা, অন্য আর সব মল্টেড পানীয়ের মধ্যে বোর্নভিটা-ই কেন সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে? কেন দু'পুরুষ ধরে মা বাবারা জোরের সঙ্গেই বলেন। তাদের বাচ্চাদের অন্য কোন পানীয়তে কাজ হবে না?

এশুধু এটির মজাদার স্বাদের জন্যে নয়। এমন কি ক্যাডবেরিস্ নামটির জন্যেও নয়। এর কারণ অন্য কিছু। বিশেষ কিছু। এ হ'ল বোর্নভিটা, যে পানীয়ের গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো।

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা

পালন-পোষণ সঠিকভাবে করুন,
বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান।

১ কে.জি.
প্যাকেও পাওয়া যায়
যার মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে
একটি মগ

OBM/3783 BEN

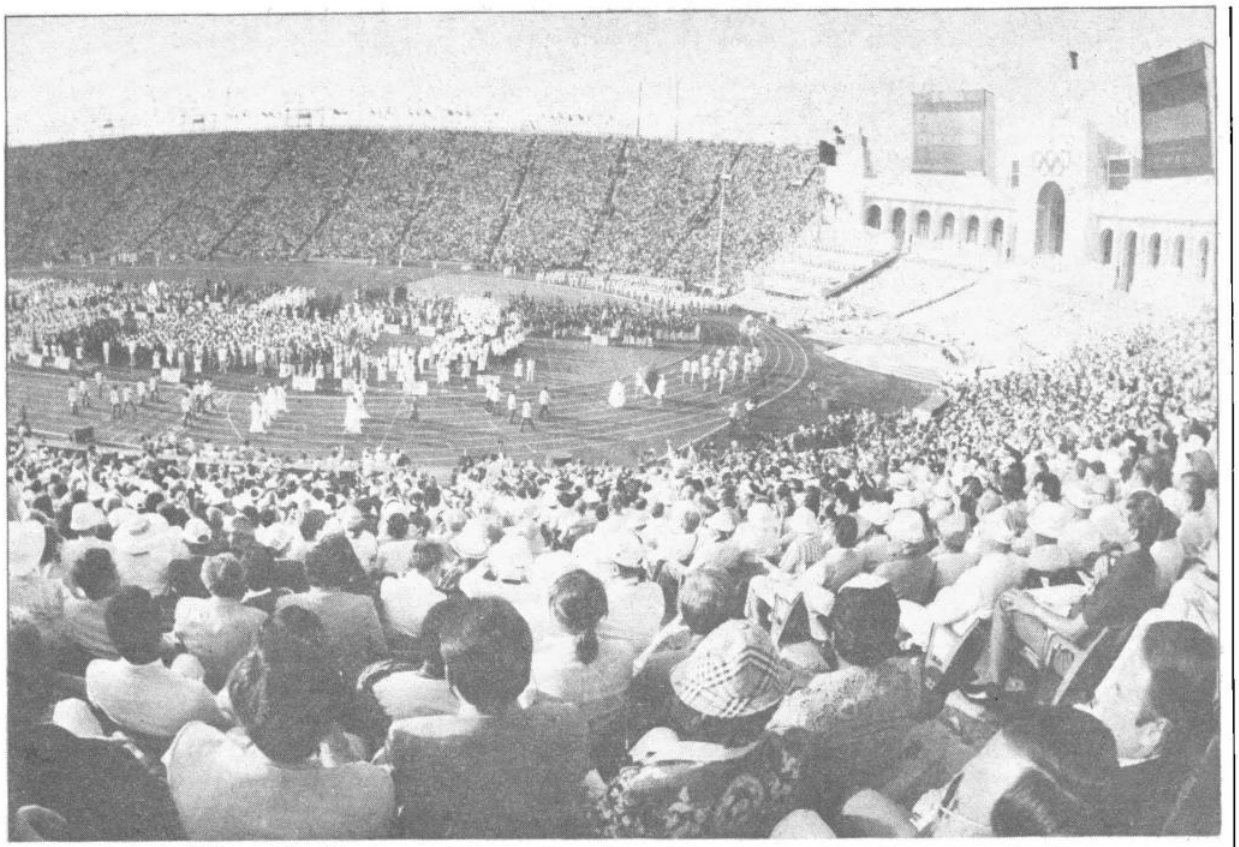

লস এঞ্জেলেসের ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার মূল স্টেডিয়াম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিনে এখানে একটি আসনও ফাঁকা ছিল না

ওলিম্পিকের আসরে

সোমা দত্ত

ছোটবেলায় আমার জ্বালায় বাড়ির ছাদে কাকপক্ষী বসতে পারত না। আমার গুলতির টিপ ছিল এমনই অব্যর্থ। তখন আমার কতই বা বয়স, পাঁচ বছরেরও কম। ওই বয়সের ছেলেমেয়েদের শোনার কথা ভূতপেত্নি আর রাজারানীর গল্প। অথচ আমার ভাল লাগত বাঘ-ভালুক, জিম করবেট আর তাঁর শিকারের গল্প। আমার এই ডাকাবুকো স্বভাব দেখে একদিন মা বললেন, "ঠিক আছে, তুই যাতে শিকারি হতে পারিস, তার ব্যবস্থা করব।"

মা-র ইচ্ছেয় একদিন আমার জন্য ছোট্ট একটা বন্দুক এল। শিকারি হবার চেষ্টায় মায়ের কোলে চেপে এরপর গেলাম বেলগাছিয়ার নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে। চারদিকে শুধু গুড়ুম-গুড়ুম শব্দ। গুলির আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। মাসকয়েক লেগে গেল শিকারি হবার সাহসটুকু অর্জন করতেই। দু-কান বাঁধা পড়ল রুমালে। বন্দুকের ভার রাখতে হল বালিশের ওপর। এক দিন আমি ট্রিগার টেপার হাতেখড়িও নিলাম।

বছরের পর বছর ঘুরল। বাঘ-শিকারি কিন্তু আর হয়ে উঠতে পারলাম না। এর বদলে হয়ে গেলাম

রাইফেল-শুটিংয়ে বাঙালি মেয়ে সোমার কৃতিত্বের কথা তোমরা সবাই জানো। পদক না-ই পাক, এবারকার লস অ্যাঞ্জেলেস ওলিম্পিকেও তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর সে রেখে এসেছে। সোমার ঝুলিতে এখন ওলিম্পিকের বিস্তর গল্প। পরপর কয়েক সংখ্যায় সেই গল্প তোমাদের সে শোনাবে। সেইসঙ্গে বলবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা।

শুটিংয়ের মেডেল-শিকারি। প্রথম মেডেলটা পেয়েছিলাম মাত্র সাত বছর বয়েসে। আর এখন তো ওইসবে ঘর ভর্তি। আমার যখন তেরো বছর বয়স তখন বাবার এক প্রবাসী বন্ধু হিমাংশু রায় একদিন আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, "এত মেডেল তোর জিম্মায় অথচ আসল মেডেলটাই নেই। তুই কি রকম শুটার রে?"

জিজ্ঞেস করলাম, "আসল মেডেল মানে?"

হিমাংশুজেঠু হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "মানে ওলিম্পিক মেডেল।"

এ-সব অবশ্য এশিয়ান গেমসেরও আগেকার কথা। বিরাশির ফেব্রুয়ারির। আমার এই হিমাংশুজেঠু থাকেন আমেরিকায়। উনিই একদিন মাকে বললেন, "আপনার ছোট মেয়েটাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন না। আমেরিকায় নিয়ে যাব। ওলিম্পিক-চ্যাম্পিয়ন তৈরি করব।"

বাবাও ছিলেন ওই সময়। ওঁরা তো এ-কথা শুনে তাজ্জব! সত্যি বলতে কী, আমার বাবা ব্যবসা-ট্যবসা নিয়েই পড়ে থাকতেন। শুটিংয়ে আমি কী করছি—কোনো খেয়ালই রাখতেন না। যতবার জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

নিতে গিয়েছি, মা আর রুনুকাকাই হতেন আমার সঙ্গী। হিমাংশুজেঠু যখন ওই প্রস্তাবটা দিলেন, তখন কিন্তু বাবার মধ্যে কিছুটা আগ্রহ লক্ষ করলাম। আমার বয়স, লেখাপড়া, ভবিষ্যৎ—এ-সব ভেবে মা-বাবা মনস্থির করতে পারছিলেন না।

হিমাংশুজেঠু কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললেন, "হামু (আমার ডাকনাম) আমার মেয়ের মতো। ওকে দিয়ে ওলিম্পিক-মেডেল তুলব—এই আমার প্রতিজ্ঞা। ওলিম্পিকের এখনও বছর-দুয়েক দেরি। আপনারা আপত্তি করবেন না। আমেরিকায় বিখ্যাত-বিখ্যাত সব কোচ আছেন। টেকসাসের ল্যানি বাসহাম তো আমার খুবই বন্ধু। ওকে যদি রাজি করাতে পারি, তাহলে হামুকে ওর হাতেই তুলে দেব।"

এ-সব কথা বলার পরে আমার দিকে ফিরে উনি বললেন, "কী রে, পারবি না এই জেঠুটাকে একটা ওলিম্পিক-মেডেল এনে দিতে?" উত্তরে ঘাড় নেড়েছিলাম আমি। জেঠু খুশিতে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, "শাব্বাশ, এই তো চাই। আমেরিকায় যাবার আগেই তো তুই ওই দেশের মেয়েদের মতো সাহসী হয়ে উঠলি রে!"

ঘাড় নাড়াটা খুবই সহজ কাজ। সেদিন ভাবতেও পারিনি, ওলিম্পিক মেডেল অর্জন করা কত কঠিন। ভাগ্যদেবী সাহায্য না করলে বিশ্বের তাবড় চ্যাম্পিয়নও বুক বাজিয়ে কখনও বলতে পারবে না—ওলিম্পিক থেকে তুড়ি মেরে মেডেল আনবই।

এই নির্মম সত্যি কথাটা এবার নিজে হাড়ে-হাড়ে টের পেয়ে গেছি লস অ্যাঞ্জেলেস ওলিম্পিকে। শুটিংয়ে যে ভুলটা কখনও করিনি—না ন্যাশনালে, না প্র্যাকটিসে—বিশ্বের সব থেকে বড় টুর্নামেন্টে গিয়ে সেই ভুলটাই করে ফেললাম আমি। ওলিম্পক-পদক আনব—এই বিশ্বাস আমার ছিল, কিন্তু পারলাম না। মা-বাবা আর হিমাংশুজেঠুর মুখে হাসি ফোটাতে এবার আমি পারলাম না।

সে যাক, ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে লাভ নেই। আক্ষেপটা আমার মনে-মনে পোষা থাক। এশিয়াডের আগে প্রথম যেবার কোচিং নিতে আমেরিকায় গিয়েছিলাম তখন ল্যানি আমায় প্রায় রোজই বলতেন, "মনের ভেতর থেকে যদ্দিন না তাগিদ আসবে, তদ্দিন তুমি চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না। রোজ ডায়েরি লিখতে বসে প্রথমেই লিখবে—আমি বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন, বিশ্বে আমার সমকক্ষ আর কেউ নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে বলবে—এই হল সোমা দত্ত, লস অ্যাঞ্জেলেস ওলিম্পকে সোনা জিতেছে।"

বছর-কয়েক আগে হলে অনেকে এ-কথা শুনে হাসাহাসি করতেন। বাঙালি মেয়ে ওলিম্পিক-চ্যাম্পিয়ন হবার স্বপ্ন দেখছে! কিন্তু তাঁদের কেউ আমাদের প্রিয় ল্যানিকে দেখার সুযোগ পাননি। সারা পৃথিবী ঝেঁটিয়ে ছেলেমেয়েরা ওঁর কাছে শুটিং শিখতে আসে। সব ছাত্রছাত্রীই ওঁর কাছে সমান। নিজে একবার ওলিম্পিকে রুপো পেয়েছিলেন। গেমস থেকে ফিরেই ভাবতে বসলেন, কিসের ঘাটতিতে সোনা পেলেন না।

সেবার ওলিম্পিক গেমসে যাঁরা সোনা পেয়েছিলেন, সারা আমেরিকা ঘুরে তাঁদের বাড়ি গিয়ে তিনি সোনা জয়ের রহস্য জানতে চেয়েছিলেন। যা-যা জেনেছিলেন সব লিখে নিয়েছিলেন নোটবুকে। তারপর বাড়ি ফিরে নানা বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রকৃত রহস্যের উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। সেইভাবে নিজেকে তৈরি করে নিয়ে পরের ওলিম্পিকেই সোনা জিতলেন ল্যানি। তার আগে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নের খেতাবও। ল্যানির দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। ওঁর অভিধানে 'পারব না' কথাটা নেই। ওঁর কথায়, শুধু দক্ষতা থাকলেই চলবে না, চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য চাই রোখ, মনের অসম্ভব দৃঢ়তা।

দাদুর মতো শিকারি হতে চেয়েছিলাম ছোটবেলায়। হয়ে গেলাম জাতীয় চ্যাম্পিয়ন শুটার। এরপর মাথায় ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হবার পোকা ঢুকিয়ে দিলেন হিমাংশুজেঠু। সেই পোকাটাকে আরও বড় করলেন ল্যানি। সিউল ওলিম্পিক যতদিন না আসবে, পোকাটা ততদিনই আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে যাবে।

এবার ভারতের ওলিম্পিক টিম থেকে কেউ আমাকে বাদ দিতে পারবেন

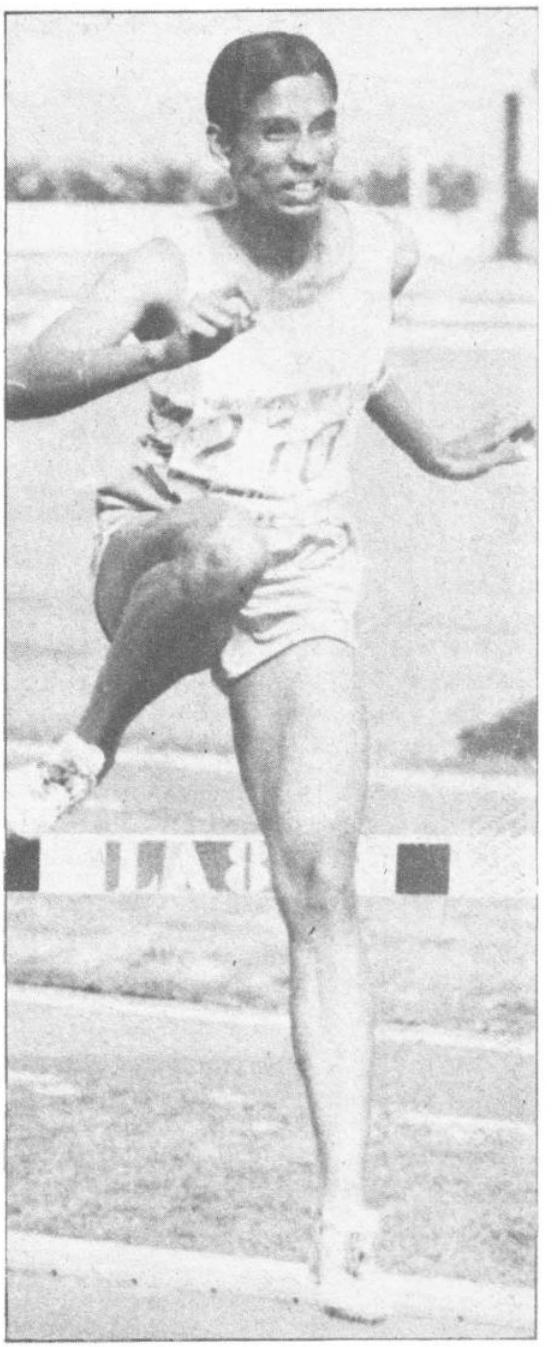

ভারতের পি.টি. উষা

না—এই-বিশ্বাস আমার ছিল। কয়েক মাস আগেই ল্যানির কাছে চলে গিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, "লস অ্যাঞ্জেলেসে এবার প্রি-ওলিম্পিক টুর্নামেন্ট হবে। ওখানে ভাল ফল করা চাই। তোমাদের দেশ থেকে আমাকে লিখেছে, তুমি কী-রকম স্কোর করছ—তা চিঠি লিখে জানাতে।"

প্র্যাকটিসে ভাল স্কোর করছিলাম। সেজন্য ওই-সব চিন্তা মাথায় ঢোকাইনি। একদিন ল্যানির সঙ্গে লস

শব্দছক আর গান–
দুয়ের মধ্যে মিল কিসে পান ?

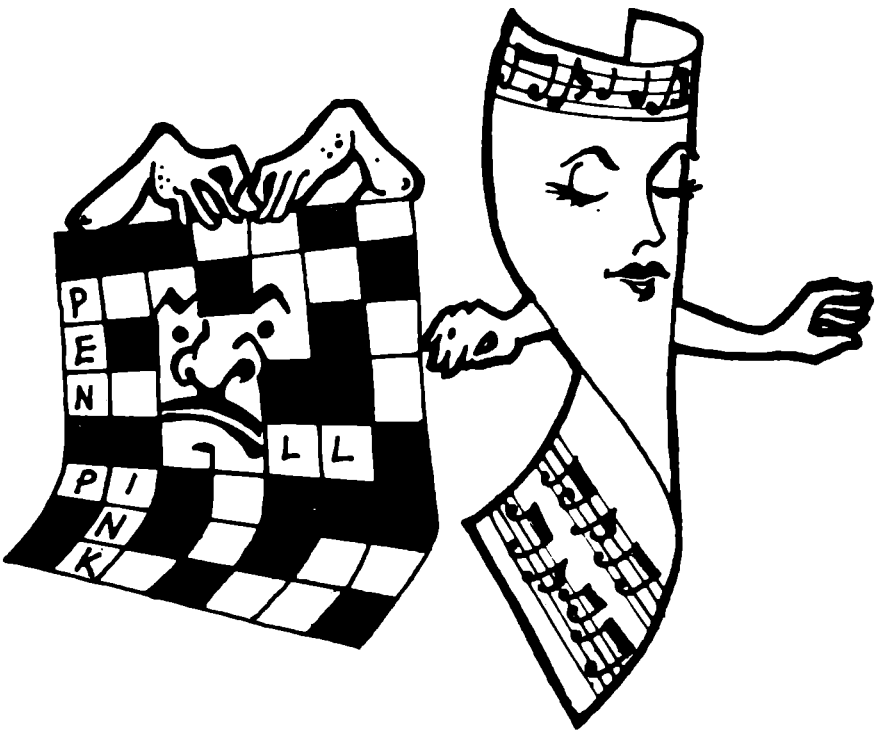

Chelpark

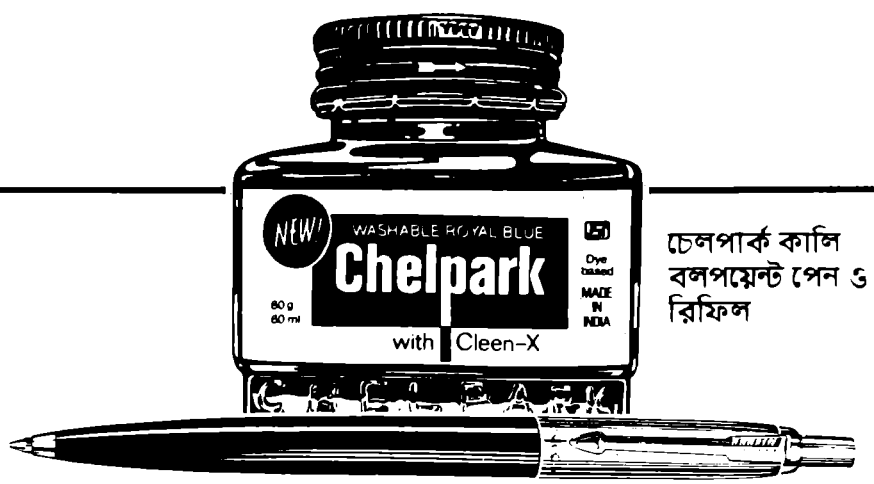

চেলপার্ক কালি
বলপয়েন্ট পেন ও
রিফিল

যে নাম লক্ষ লক্ষ মানুষের
আঙুলের ডগায়।

CCL-1654 B

অ্যাঞ্জেলেসের প্লেনে চেপেও বসলাম প্রি-ওলিম্পকে খেলতে যাবার উদ্দেশে। যে-সব দেশ এবার গেমস বয়কট করেছে, তাদের অনেকেই গিয়েছিল প্রি-ওলিম্পিকে। যেমন রাশিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গারি ও পূর্ব জার্মানি।

ওই সময় দিন-সাতেক লস অ্যাঞ্জেলেসে ছিলাম। শহরটার সঙ্গে মোটামুটি খাপ খাইয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিরাট-বিরাট বাড়ি, চওড়া রাস্তা—ছড়ানো শহর। লস অ্যাঞ্জেলেস আবার সিনেমারও শহর। বিখ্যাত হলিউডের কথা তো সকলেরই জানা। এ-ছাড়া হাতের কাছেই ডিজনিল্যাণ্ড। অদ্ভুতুড়ে সব কাণ্ড সেখানে। তা, প্রি-ওলিম্পিকের সময় ল্যানির সঙ্গে ঘুরেই আমার এসব দেখা হয়ে গেল। শুটিংয়েও ভাল রেজাল্ট করলাম। স্কোর-কার্ড ওখান থেকেই ল্যানি পাঠিয়ে দিলেন দিল্লিতে। আমার আগে আর কোনো ভারতীয় মেয়ে-শুটার ওলিম্পিকে যেতে পারেনি। মস্কো ওলিম্পিক পর্যন্ত মেয়েদের শুটিং আলাদা করে হয়নি। এতদিন মেয়েদের লড়তে হত পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে। এবারই প্রথম আলাদা ব্যবস্থা। প্রি-ওলিম্পিকেই বুঝে গেলাম, আমার ইভেণ্টে চারশো পয়েণ্টের মধ্যে তিনশো নব্বুই করতে পারলে মেডেল জেতা কঠিন হবে না। ওখানে যে-সব শুটার গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ওলিম্পিক-বয়কটকারীদের স্কোর বাদ দিয়ে হিসাব কষেছিলাম। ওই সময় প্রি-ওলিম্পিকে গিয়ে আমার অবশ্য একটা লাভ হয়েছিল। সারা বিশ্বের সেরা মেয়ে-শুটারদের চাক্ষুষ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। যাঁরা পরে ওলিম্পিকে গিয়েছিলেন, তাঁদের তো বটেই, এমনকি যাঁরা ওলিম্পিক বয়কট করেছিলেন তাঁদের সঙ্গেও শুটিং করেছি। ভারতের প্রতিযোগীদের মধ্যে এবার এই সুযোগটা কিন্তু আর কেউ পাননি।

এইসব কারণে ১৮ জুলাই যখন ওলিম্পিকে অংশ নেবার জন্যে আবার লস অ্যাঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে নেমেছিলাম তখন আর ততটা অবাক হইনি। আমার যাবার দু-দিন আগে দিল্লি থেকে আমাদের প্রথম দলটা ওখানে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি গেলাম ল্যানির সঙ্গে টেকসাস থেকে। লস অ্যাঞ্জেলেসে তখন ভ্যাপসা গরম। অনেকটা দিল্লির আবহাওয়ার মতো। কড়া রোদ অথচ ঘাম হয় না।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের মার্চ পাস্ট

ল্যানি থাকবেন হোটেলে। ওঁর কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ওলিম্পিকে অংশ নেবে। সংগঠন-কমিটি ওঁকে আলাদাভাবে আমন্ত্রণও করেছিলেন। আমার থাকার জায়গা হয়েছিল গেমস ভিলেজে। দু-জনে দু-দিক যাব। যাবার আগে ল্যানি বললেন, "আগামীকাল শুটিং-রেঞ্জে যাবে। সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ওখানে।" এই বলে উনি আমাকে রিসেপশন কমিটির হাতে দিয়ে হোটেলমুখো হলেন।

এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে কাগজ ভাঁজ করে হাওয়া খেতে-খেতে দেখলাম, রিসেপশনের লোকরা ভিলেজে ফোন করে চট করে জেনে নিলেন সোমা দত্ত নামে কোনো ভারতীয় প্রতিযোগীর আসার কথা আছে কি না। ছবি তুলে চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওঁরা ভিলেজের প্রবেশপত্র ঠিকঠাক করে দিলেন। মার্কিনিরা যে কী চটপট কাজ সারেন, না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। ওঁরা আমাকে বলে দিলেন ভিলেজে যেতে হলে কোন্ রঙের বাস ধরতে হবে। এশিয়াডের সময় দিল্লিতে গেমস ভিলেজ ছিল এক জায়গায়। লস অ্যাঞ্জেলেসে তিনটে আলাদা-আলাদা জায়গায়। ভারতীয় দলের থাকার জায়গা ছিল সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে। ওখানে যাবার জন্য আমাকে উঠতে হল লাল রঙের ওপর সাদা ডোরা-কাটা বাসে।

ভিলেজ গেটে পৌঁছে আবার কার্ড করাতে হল। এমন কার্ড, যার তলার দিকটা একটা বিশেষ মেশিনের ওপর ঘষলেই বিপ্-বিপ্ আওয়াজ হবে। অর্থাৎ বোঝা যাবে, এই কার্ডধারী সত্যি-সত্যিই প্রতিযোগী। নিরাপত্তার কারণে এই বিশেষ ব্যবস্থা। মিউনিখ ওলিম্পিকের সময় গেমস ভিলেজের ভিতরেই খুনোখুনি হয়েছিল। খবরের কাগজে পড়েছি, এবারও অনেকে হুমকি দিয়েছিল, গেমস ভণ্ডুল করে দেবে। সেইজন্যই এত সতর্কতা। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরটা যে পুলিশে ছেয়ে ছিল, পরে আমরা টের পেয়েছি। প্রায়ই আকাশে হেলিকপ্টার চক্কর দিত। যাই হোক, ভারতীয় দল ভিলেজের যেখানে ছিল, সেখানে পৌঁছলাম রাত প্রায় সাড়ে-ন'টায়। এশিয়াডে ছেলেদের আর মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা ছিল আলাদা-আলাদা। ওলিম্পিকে সবাই একসঙ্গে। আমাদের ঘরের নম্বর ১৩০। আধো-অন্ধকারের মধ্যে দরজা ঠেলে ঢুকলাম। চার-পাঁচটা মেয়ে ঘুমোচ্ছিল। কাউকেই চিনি না। একই টিমের মেয়ে আমরা, অথচ কারও সঙ্গে আলাপ নেই। সারা দিনের ঝক্কিতে তখন আমি ভীষণ ক্লান্ত। বিছানায় পড়তেই ঘুম নেমে এল চোখে।

পরদিন সকালে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। কে যেন গায়ে ঠেলা দিচ্ছিল। জানলার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম—ঝকঝকে রোদ্দুর। ঘাড় ফেরাতেই দেখি, রোগা, লম্বা একটা মেয়ে রোদ্দুরের মতোই একগাল হাসি ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে সে বলল, "আই অ্যাম ঊষা। গেট রেডি ফর ব্রেকফাস্ট। উই আর গোয়িং টু দ্য ডাইনিং-হল।" আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে। ওহ্! এই তাহলে পি. টি. ঊষা!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

বাঙ্গুর মালটিপারপাসের প্রধানশিক্ষক কী বলেন

বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন হলেও, কলকাতার যে-কয়েকটি স্কুল এ-যাবৎ লেখাপড়ায় ধারাবাহিক ভাবেই উচ্চ মান বজায় রেখে চলেছে, নারায়ণদাস বাঙ্গুর মেমোরিয়াল মালটিপারপাস স্কুল তাদের অন্যতম। নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ের (অধিকাংশ মানুষ এখনও যাকে ভি আই পি রোড বলে জানেন) কোল ঘেঁষে ছিমছাম্ শান্ত পরিবেশে স্কুলের বিশাল এলাকা। ১৯৬৬ সালে স্কুলটির প্রতিষ্ঠা। বস্তুত এর প্রথম প্রধানশিক্ষক প্রয়াত জনার্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টাতেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা পায়। প্রতিষ্ঠিত হবার মাত্র দু'বছরের মধ্যেই এই স্কুলের ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান লাভ করে। পরবর্তী কালেও একাধিকবার এই স্কুলের ছাত্ররা পর্ষদের পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

আমি যখন এই স্কুলে যাই, শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায় তখন সেখানে

অস্থায়ী প্রধানশিক্ষক হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন। তাঁর নিজের বিষয় বাংলা ও ইংরেজি। গোড়া থেকেই তিনি এই স্কুলে আছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতা প্রায় ২৫ বছরের।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতে, "ভাল লেখাপড়া করানোয় স্কুলের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি এর অনেকটাই নির্ভর করে বাড়ির পরিবেশের ওপর। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে পড়ার আগ্রহ আপনি জন্মায়। প্রচুর খেলেই যেমন স্বাস্থ্য ভাল হয় না, সুষম আহার চাই, তেমনি একটানা পড়ে গেলে কিংবা পরীক্ষার খাতায় অপ্রয়োজনীয় একরাশ কথা লিখলেই বেশি নম্বর পাওয়া যায় না। পড়া এবং লেখার মধ্যেও একটা পারিপাট্য চাই।"

"ইংরেজি ও বাংলা কীভাবে পড়তে হবে?"

আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, "দুটি ভাষাতেই প্রশ্নানুগ উত্তরদানের অভ্যাস করতে হবে। বাংলায় হয় সাধু নয় চলিত, যে-কোনো একটি ভাষা ব্যবহার করা উচিত। দুটি ভাষাতেই টেক্স্ট বই খুব খুঁটিয়ে পড়তে হবে। অভিধান ব্যবহার করার অভ্যাস করা খুব দরকার ইংরেজি থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে তর্জমার অভ্যাস খুব ভাল। টেস্টপেপার দেখে একেবারে ক্লাস নাইনের গোড়া থেকেই গ্রামার অনুশীলন করতে হবে।"

অঙ্ক সম্পর্কে তিনি জানালেন, "অঙ্কে অনেকেরই ভীতি জন্মায় ছোটবেলা থেকে। সাধারণ ছাত্রদের সম্পাদ্য, অ্যালজেব্রা, পরিমিতির ফরমুলাভিত্তিক অপেক্ষাকৃত সহজ অঙ্ক জোর দিয়ে করা উচিত। জ্যামিতির উপপাদ্যে প্রতিটি স্তরে কারণ নির্দেশ করতে হবে। প্রশ্নমালার শক্ত শক্ত অঙ্ক বেছে না করে, প্রথম দিকের অপেক্ষাকৃত সহজ অঙ্ক দিয়ে শুরু করে অঙ্ক করতে হবে।"

ইতিহাস পড়া সম্পর্কে তিনি বললেন, "প্রায় প্রতিটি অধ্যায় থেকেই প্রশ্ন দেওয়া হয়। সাধারণত বিগত বছরে যে অধ্যায় থেকে ব্যাখ্যামূলক বড় প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী বছরে সে-অধ্যায় থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া হয়। কাজেই সমগ্র কোর্সটি ভালভাবে পড়া দরকার।"

"আর ভূগোল?"

উত্তরে শ্রীমুখোপাধ্যায় বললেন, "ভূগোল পড়বার সময় ম্যাপ দেখবার অভ্যাস করা দরকার। উত্তর লেখার সময়েও ম্যাপ আঁকতে হবে, যেখানেই সম্ভব।"

তাঁর মতে, আনন্দমেলা ছাত্রছাত্রীদের একটি মূল্যবান সহায়ক পত্রিকা।

অপরাজিতা

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

এবার ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে একই নম্বর পেয়ে দুজন ছাত্র শুদ্ধসত্ত্ব ভট্টাচার্য এবং প্রসেনজিৎ সাহা। প্রসেনজিৎ অনেকদিন কলকাতায় নেই।

শুদ্ধসত্ত্ব গোড়া থেকেই এই স্কুলে পড়ছে। থাকে লেকটাউনের কাছে কালিন্দীতে। তার বাবা অধ্যাপক। দুজন গৃহশিক্ষকের কাছে সে অঙ্ক ও জীবনবিজ্ঞান পড়ে। বাকি বিষয়গুলো বাবা পড়ান।

শুদ্ধসত্ত্ব দিনে প্রায় ঘণ্টা-আটেক পড়ে। পরীক্ষার সময় আরও বেশি। প্রতিটি প্রশ্নই সে লিখে তৈরি করে। স্কুলের শিক্ষকরাও তাকে খুব সাহায্য করেন। জীবনবিজ্ঞান তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। ভবিষ্যতে তার ডাক্তারি পড়বার ইচ্ছে আছে।

তবে শুদ্ধসত্ত্ব শুধু পড়াশোনাই করে না, সে ভাল আবৃত্তিও করে। স্ট্যাম্প সংগ্রহ তার হবি। ক্রিকেট খুব প্রিয় খেলা। সে নিয়মিত আনন্দমেলা পড়ে। আনন্দমেলার উপন্যাসগুলো তার দারুণ লাগে।

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

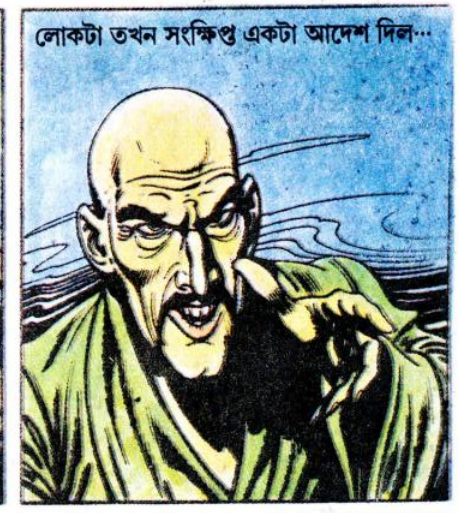

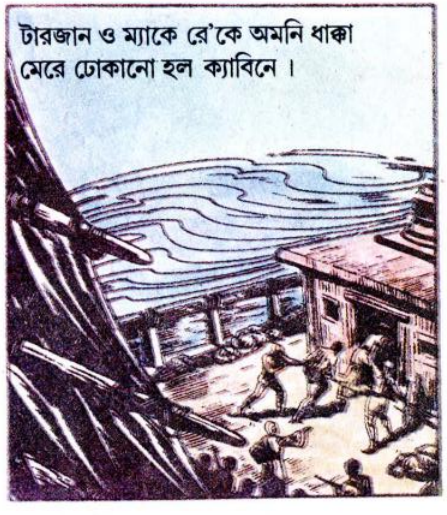

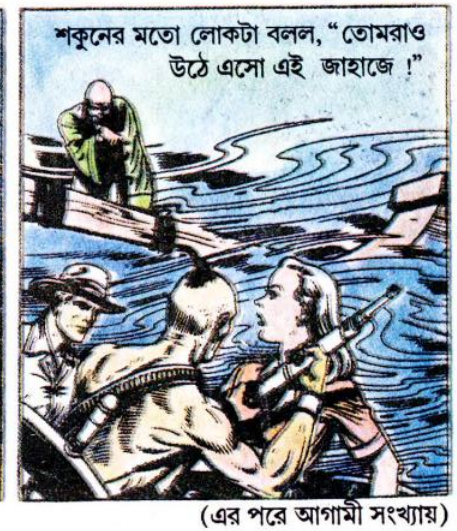

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর তার দিদি ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে অনেক রকম বাগান করেছিলেন,কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে এসেছিলেন, তারপর থেকেই তিনি উধাও। এখানে এককড়ি নামে একজন লোক রান্নার কাজ করে, সে বেশ পাগলাটে ধরনের। জ্যাঠামশাই কোথায় গেছেন তা সে জানে মনে হয়, কিন্তু বলতে চায় না। এখানে এমন কয়েকটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, দিপু যার মানে বুঝতে পারে না। রাত্তিরবেলা দিপু তার দিদিকে না-জানিয়ে চুপি চুপি বাইরে এল, পুকুরঘাটের কাছে সে দেখতে পেল একজন রহস্যময় অচেনা মানুষকে। তারপর....

ইরানির ঘুম ভাঙে একটু দেরিতে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়ছে তার মুখে, তবু সে পাশ ফিরে শুচ্ছে। সকালবেলা মা ডাকাডাকি না করলে সে উঠতেই চায় না। সে যে নতুন জায়গায় এসেছে, সে-কথা তার মনে নেই। ইরানি আজও ভাবছে, মা তো তাড়া লাগাবেই, তার আগে উঠে কী হবে ?

বেলা বেশ বাড়বার পর এক সময় কেষ্ট বাইরে থেকে ডেকে বলল, "ও দিদিমণি, উঠবে না ? তোমরা কি দুধ খাবে, না চা খাওয়ার অভ্যেস আছে ?"

দু'তিনবার এ-রকম ডাকাডাকির পর ইরানি বুঝতে পারল, এটা তাদের বাড়ি নয়, এটা বর্ধমানে জ্যাঠামশাইয়ের গ্রাম।

ইরানি চোখ না খুলেই বলল, "এই দিপু, দরজা খুলে দে ! বল আমরা দুধ খাব।"

দিপুর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে ইরানি চোখ খুলে তাকাল। পাশের বিছানায় দিপু নেই।

তাতে সে চিন্তিত হল না। দিপু রোজই তার থেকে আগে ওঠে। কলকাতায় দিপু ভোরে সাঁতার কাটতে যায়। বৃষ্টির দিনে ছাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ইরানি তাকিয়ে দেখল দরজার ছিটকিনি খোলা।

একটু শীত-শীত লাগছে, ইরানি বিছানা থেকে উঠে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিল। তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে বলল, "কেষ্টদা, আমরা চা খাই না। গরম দুধ খেতে পারি। দিপু কোথায় ?"

কেষ্ট বলল, "দেখিনি তো। ঘরে নেই ?"

ইরানি বলল, "না। গেছে কোথাও ঘুরতে !"

কেষ্ট বলল, "তোমাদের পুকুরঘাটে যেতে হবে না। বাথরুমে জল তুলে দিয়েছি, ওখানেই মুখ-টুখ ধুয়ে নাও।

ইরানি বলল, "আমার দুধে চিনি দিও না। আমি মিষ্টি দুধ খেতে পারি না !"

কেষ্ট বেশ অবাক হল। মিষ্টি ছাড়া দুধ আবার কেউ খেতে পারে নাকি ? কলকাতার মেয়েদের ধরন-ধারণই আলাদা !"

ইরানি বাথরুমে এসে দেখল দিপুর টুথ-ব্রাশ শুকনো। মুখ-টুখ না ধুয়েই কোথায় গেল ছেলেটা ?

দাঁত মাজতে মাজতেই ইরানি ঠিক করে ফেলল, এখানে থাকবার আর কোনো মানে হয় না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়বে।

একটা কচি-কলাপাতা-রঙের ফ্রক পরে একেবারে কলকাতায় যাবার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল ইরানি

দুটো বেশ বড় এনামেলের মগ ভর্তি দুধ নিয়ে হাজির হল এককড়ি। খুব গরম দুধ, তা থেকে ধোঁয়া উড়ছে।

এককড়ি একগাল হেসে বলল, "তোমরা শুনলুম দুধে মিষ্টি খাও না ? তা হলে কি নুন দেব ?"

এ-সব রসিকতা শোনার মতন মেজাজ নেই এখন ইরানির। সে কলকাতায় ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে একটা মগ হাত বাড়িয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "দিপু কোথায় ? তাকে ডাকুন।"

এককড়ি বলল, "তাকে তো আমি দেখিনি।"

একটা কাঁসার থালায় অনেকখানি মুড়ি আর কয়েকটা মর্তমান কলা হাতে নিয়ে এসে কেষ্ট বলল, "কই, তাকে তো খুঁজে পেলুম না। নেবুতলা, পেয়ারাবাগান, পুকুরধার,কোথাও তো সে নেই !"

ইরানি ভুরু কুঁচকে বলল, "নেই ? কোথায় গেল দিপু ?"

দিপুটা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায় বটে, কিন্তু ইরানিকে না জানিয়ে সে তো বেশি দূরে যাবে না।

এককড়ি হঠাৎ বলল, "মাঝরাত্তিরে বেরোয়নি তো আবার ? আমার সন্দেহ হচ্ছে..."

ইরানি মুখ তুলে বলল, "তার মানে ? কী সন্দেহ হচ্ছে ?"

এককড়ি বলল, "দ্যাখো দিদিমণি, তোমার ঐ ভাইটি বড় সহজ নয়। বেশ ডাকাবুকো, একেবারে ভয়ডর নেই।"

ইরানি বলল, "এখানে ভয় পাবার কী আছে ?"

এককড়ি দু'দিকে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, "আছে, আছে, আছে ! তাই তো আমি নিশুতি রাতে বেরোই না।"

কেষ্ট তাকে ধমক দিয়ে বলল, "তুমি থামো তো ! আমি দেখছি খোকাবাবু কোথায় গেল !"

দুধের মগটা নামিয়ে রেখে ইরানি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "নিশ্চয়ই লেবুবাগানে ঢুকে বসে আছে। চলুন, আমি গিয়ে দেখছি।"

আজ আকাশে একটুও মেঘ নেই, সুন্দর রোদ ঝলমল করছে। শোনা যাচ্ছে নানারকম পাখির ডাক। এরকম একটা সকালবেলা কোনোরকম বিপদ বা ভয়ের কথা কল্পনা করাই যায় না।

ইরানি ভাবল, দিপুর মাথায় প্রায়ই ডিটেকটিভ সাজার শখ চাপে। কোথাও একটা পোড়া দেশলাইকাঠি কিংবা আধখানা পায়ের ছাপ নিয়ে মত্ত হয়ে আছে নিশ্চয়ই।

ইরানি প্রায় ছুটতে ছুটতেই চলে এল লেবুবাগানের কাছে। ভেতরে ঢুকতে যাবার আগেই এককড়ি বলে উঠল, "দাঁড়াও দাঁড়াও, ওই তিনটে গাছ বাদ দিয়ে, ওদের ছুঁয়ো না !"

ইরানি থমকে দাঁড়িয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল এককড়ির দিকে। এই লোকটা কী যে আবোল-তাবোল বকে, তার কোনো মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না।

"কেন, এই তিনটে গাছ ছোঁয়া যাবে না কেন?"

এককড়ি একদিকে আঙুল তুলে বলল, "ওই যে ওইটা, ওইটা আর ওইটা। ও-তিনটে বড্ড পাজি! ওদের বিশ্বাস নেই।"

ইরানির রাগ হয়ে গেল। তাকে কি ওরা ছেলেমানুষ ভেবেছে? যা-তা বলে ভয় দেখাবে?

এককড়ি যে গাছগুলোর দিকে আঙুল তুলেছে, ইরানি এগিয়ে গিয়ে সেই একটা গাছের গায়ে হাত রাখল। কিছুই হল না। পরপর তিনটে গাছকেই ছুঁয়ে দিল সে।

মুখ ফিরিয়ে রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল, "এই তো ছুঁলাম! কী, হল কী?"

এককড়ি বলল, "এখন তোমাকে দেখে গো-বেচারা সেজেছে। আসলে ওরা পাজি। তোমার ভাইকে তো ঐ একটা গাছই মেরেছিল।"

ইরানি কেষ্টর দিকে তাকাল। তার মুখ দেখে মনে হয় যেন সেও এইসব কথা একটু-একটু বিশ্বাস করে।

ইরানি এককড়িকে ধমক দিয়ে বলল, "এসব বাজে কথা আর আমি শুনতে চাই না।"

তারপর সে ঢুকে পড়ল লেবুবাগানের মধ্যে।

কাল রাত্তিরে খুব বৃষ্টি পড়েছে। মাটি ভিজে-ভিজে। কেউ এখানে ঢুকলে তার পায়ের দাগ বোঝা যাবে। কিন্তু ইরানি কোনো পায়ের ছাপ দেখতে পেল না।

পুরো লেবুবাগানটা ঘুরে দেখে এল, কোথাও দিপুর কোনো চিহ্ন নেই।

জ্যাঠামশাইয়ের মতন দিপুও হারিয়ে যাবে, এটা ইরানি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। দিপু কি ইচ্ছে করে তাকে কষ্ট দিতে পারে?

পেয়ারাবাগানটা অনেক ফাঁকা-ফাঁকা। বাজ পড়ে অনেকগুলো গাছ ঝলসে গেছে। সেই বাগানের ভেতরে ঢোকার দরকার হয় না, বাইরে থেকেই বোঝা যায় যে, ভেতরে কেউ নেই।

ইরানি চলে এল পুকুরধারে।

পুকুরঘাটে লুঙ্গিপরা, খালি গায়ে একজন লোক বসে আছে। লোকটি মুখ ফেরাতেই ইরানি চিনতে পারল, আগের দিনের সেই পাগল মুরশেদ।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করল, "ও মুরশেদভাই, আমাদের খোকাবাবুটিকে সকালে কোথাও দেখেছ নাকি?"

কেষ্টর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মুরশেদ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ইরানির দিকে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "আর-একজন মিসিং? বড়বাবুর পর ছোটবাবু? ওরা আমাকে কেন নেয় না বলো তো!"

এককড়ি বলল, "তোমাকে আর নিতে বাকি আছে কী? তুমি কি আর নিজের মধ্যে নিজে আছ? ওসব কথা ছাড়ো। ছেলেটিকে দেখেছ কোথাও?"

ইরানির হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। এখানে কি সবাই পাগল? কারুর কাছ থেকে একটা সহজ উত্তর পাওয়া যাবে না? দিপুকে সে এখন কোথায় খুঁজবে?

ইরানি অতিকষ্টে নিজেকে সামলাল। এদের সামনে সে কিছুতেই দুর্বলতা প্রকাশ করবে না।

কেষ্টর দিকে ফিরে বলল, "আমি থানায় যাব!"

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

বড়গল্প

মজারুমামা

আশাপূর্ণা দেবী

"ধেত্তারি, ভাল লাগছে না।" ফোটন বেজার গলায় বলে উঠল, "আজ আর আসছে না মজারুমামা ! ক্যারমবোর্ডটা সাজা বরং। পেটা যাক ! তা-ই যাক ! কী আর করা !"

ছোটন বোর্ডটা পেতে ঘুঁটি সাজিয়েছে, ফোটন স্ট্রাইকারটাকে মাথায় ঘষে নিয়ে বোর্ড ফাটাবার জন্যে তাক করছে, ব্যস। ফস করে আলোটা নিভে গেল ! ঝুপ করে ঘরের মধ্যে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার ! আর এমনই আশ্চয্যি, ঠিক সেই মোমেণ্টেই ঘটল এই অলৌকিক ঘটনাটি ! একদম ঝপ করে। দরজায় মজারুমামা !

যে মজারুমামার জন্যে ফোটন ছোটন রিঙ্কি পিঙ্কি সেই কখন থেকে ছট্‌ফট্ করছে। রিঙ্কি তো তখন থেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায় চোখ ফেলে। পিঙ্কি একবার করে ছুটে যাচ্ছে আর আবার ঘরে ফিরে এসে হাত-পা ছুঁড়ছে, "আরে বাবা রে বাবা ! কী হল মজারুমামার ? আসছে না কেন ?"

তা এরাও তো সেই কথাই বলে চলেছে মিনিটে মিনিটে, ফোটন আর ছোটন। সত্যি, কী হল মজারুমামার ? এত দেরি করছে কেন ?

"নাঃ, হোপলেস ! কী যেন একখানা মজারুমামাটা !"

"আচ্ছা হল কী বল তো ? কী হতে পারে ?"

হতে কত কীই পারে অবশ্য ! আবার কিছু না হতেও পারে।

"ইশ ! কী যে বিচ্ছিরি লাগছে ! ছোটমাসি পষ্ট করে বলে গেল বিকেলে, 'মজারুদা আসছে। আমি বাড়ি নেই বলে যেন কেটে পড়ে না, তোরা একটু জমিয়ে নিয়ে বসিয়ে রাখবি !'"

"হুঁ ! বিকেল ! বিকেল আবার কালকে হবে।"

"মজারুমামাটা এই রকমই। মনে নেই সেবার পিকনিকে যাবার দিন ? লাস্ট মোমেন্টে আসতে পারবে না খবর দিয়ে সব গুবলেট করে দিল। ভীষণ অদ্ভুত !"

"এই এ রকম বলিস না ! তেমনি আবার পিঙ্কির জন্মদিনে কেউ নেমন্তন্ন না করতেই নিজে থেকে এসে কী মজাটাই না করে গেল ভাব !"

"তা সত্যি রে। সেই কোথা থেকে যেন ছৌ-নাচের এক রাক্ষুসে মুখোশ নিয়ে এসে পরে, সবাইকে ভয় পাইয়ে—হি হি হি ! নেমন্তন্ন না করার জন্যে রাগটাগ নেই।"

"হুঁ রে, মনে পড়েছে। বলেছিল 'পিঙ্কির জন্মদিন আর মনে রাখব না ? কী দিনে জন্মেছিল তা বল ? স্বয়ং কেষ্টঠাকুরের জন্মদিনে।' মা বলল, 'তোকে কে নেমন্তন্ন করবে বাবা। কখন যে কোথায় থাকিস্ তা তুইই জানিস ! আর কেষ্টঠাকুরই জানে।'"

ফোটন আর ছোটনের এই ক্ষোভ দুঃখ অস্থিরতা আর স্মৃতিচারণের মাঝখানে মাঝখানে রিঙ্কি ছুটে ছুটে এসে বলে যাচ্ছে, "ও রে বাবা রে, এত দেরি করছে কেন রে মজারুমামা ! আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে ! এই দাদা, রাস্তায় গিয়ে দেখ্ না !"

"রাস্তায় গিয়ে ?"

ফোটন বলেছে, "তুই তো বারান্দা থেকে ঝুঁকে গলাটাকে প্রায় রাস্তায় ঠেকিয়েই দাঁড়িয়ে আছিস ! আর কী দেখব ?"

পিঙ্কি ডুকরে উঠছে মাঝে-মাঝে, "ছোটমাসি যে কেন বলল, মজারুমামা আসবে ! এত দেরি হয়ে গেল, আর এসেছে। ধেত্তারিকা !"

তা সত্যি, এদের এই আশাভঙ্গটি বড়ই দুঃখজনক !

মজারুমামা মানেই তো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর উৎকট উৎকট সব মজা।... মজারুমামা মানেই জমজমাটি মজলিশ, মিনিটে মিনিটে হাসির হুল্লোড়।...মজারুমামা মানেই গায়ে-কাঁটা-দেওয়া ভৌতিক, আধাভৌতিক, দৈবিক, দুঃসাহসিক, অদ্ভুতুড়ে সব নতুন নতুন গল্প !... তা ছাড়া কখন কোন্ স্টাইলে যে হঠাৎ হঠাৎ একখানি মজা প্রেজেন্ট করবে মজারুমামা তা বোধহয় মজারুমামারও অজানা !

ছোট্কা তো বলে, "তোদের মজারুমামার কাছাকাছি এলে, পকেটে একটা ছুঁচ সুতো মজুত রাখা উচিত। কে জানে বাবা কখন না হাসতে-হাসতে পেটটা ফেটে যায় !"

'মনোজ'কে 'মজারু' করে ফেলা ওই ছোট্কারই অবদান !

কিন্তু কতদিন যে আসেনি মজারুমামা !

আজ যখন বেরোবার সময় ছোটমাসিরা বলল, "এই, আজ বিকেলে মজারুদা আসবে, তোরা একটু বসিয়ে রাখিস, যেন পালায় না" শুনে তখন এরা মানে ফোটন ছোটন রিঙ্কি পিঙ্কি আহ্লাদে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল।

"অ্যাঁ। মজারুমামা ?"

"সত্যি ?"

"ঠিক ?"

"একদম ঠিক। ওখানে থাকতে চিঠিতে জানিয়ে রেখেছে আমায় ! উঃ, কতদিন দেখা হয়নি !"

রিঙ্কি অবশ্য একবার বলে ফেলেছিল, "তো তোমার সঙ্গেই দেখা করতে আসছে মজারুমামা, তুমি চলে যাচ্ছ ? একদিন না হয় সিনেমাটা বাদ দিতে ছোটমাসি !"

শুনে দুঃখে ভেঙে পড়েছিল ছোটমাসি। বলেছিল, "সিনেমাটা বাদ ? কোন্ প্রাণে বলতে পারলি রে একথা ? দশদিনের তো মেয়াদ, তার চার চারটে দিন কেটেই গেল। একদিনই মাত্র দুটো হল-এ সিনেমা দেখেছি, আর ক'দিন তো মাত্র একটা করে। তবেই বল্ আর কটাই বা দেখে উঠতে পারব ? কোথায় পড়ে থাকি জানিস ? বাংলা সিনেমার মুখ দেখতে পাই ? এসেই তো পড়ব বাবা। রাত্তিরে তো খাবে এখানে মজারুদা, তখন আড্ডা হবে।"

চলে গিয়েছিল ছোটমাসি ফোটন কোম্পানির মাকে কব্জা করে নিয়ে। দুটো হল-এ টিকিট কাটা আছে। তিনটে ছটা,

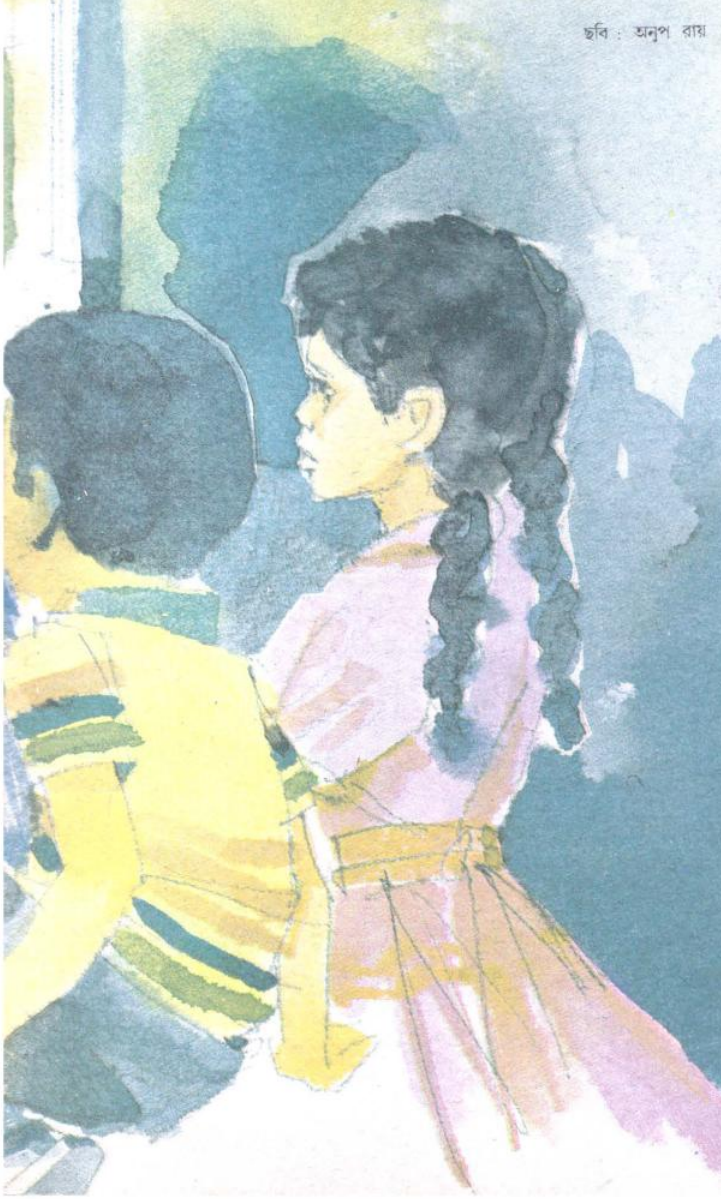

ছবি : অনুপ রায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভক্ত শুধু বড়রা নয়, ছোটরাও

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে বড়দেরই প্রিয় লেখক তা নয়, ছোটরাও তাঁর কিশোরসাহিত্যের দারুণ ভক্ত। হবে নাই বা কেন। যেমন সুন্দর গল্প তেমনই সুন্দর ভাষা আর বর্ণনাভঙ্গি। শরদিন্দুর যাবতীয় ছোটদের লেখা নিয়ে বেরিয়েছে শরদিন্দু অমনিবাসের চতুর্থ খণ্ডটি। এই একটিমাত্র বইতেই সদাশিবের দারুণ সব কাহিনী, অজস্র গল্প আর আকর্ষণীয় অন্যান্য লেখা। আরেকটি বই হল, 'ভূমিকম্পের পটভূমি'। দুটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর এক অনবদ্য সংকলন এই বইটি। একটি কাহিনীতে একটি নির্জন দ্বীপ আর সেখানকার বাসিন্দা বলতে ছোট্ট একটি মেয়ে ও তার ক্যাঙারু-বন্ধুর গল্প, আরেকটিতে পাঁচশো বছর আগেকার এক যুবরাজ যুবরাণীর বহু জন্ম বাদে পুনর্মিলন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই

ভূমিকম্পের পটভূমি ৫·০০

শরদিন্দু অম্নিবাস ৪র্থ খণ্ড ৩০·০০

অরূপরতন ভট্টাচার্যর বই বিজ্ঞানের সহজপাঠ এবং প্রথমভাগ

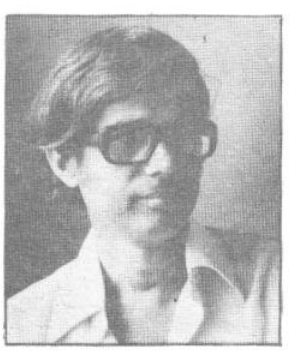

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক অরূপরতন ভট্টাচার্য এমন দরকারী অথচ এমন মজাদার চারটি বই লিখেছেন তোমাদের জন্য, যা প্রত্যেকের পড়া দরকার। অল্পবয়স থেকেই যাতে ছোটরা জেনে যায় বাস্তব জীবনের বহু দরকারি কথা, যাতে হয়ে ওঠে চটপটে ও তুখোড়, সেইদিকে তাকিয়েই এসব বই লেখা। এ-বইগুলো বলা যায় বিজ্ঞানের সহজ পাঠ এবং প্রথম ভাগ। কোনটায় তিনি শিখিয়েছেন মাপের নানারকম হিসেব অর্থাৎ মিটার কখন আর লিটার কখন, কখন গ্যালন কখন কিলোগ্রাম—এইসব হিসেব, একটি বই নানা রকম আকার নিয়ে, একটিতে তিনি উত্তর দিয়েছেন ঋতুদের খেয়ালিপনা নিয়ে মনের কোণে জমে-থাকা প্রশ্নের উত্তর, একটি বইতে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানান জটিলতা। সব বইতেই ছবি, সহজে বোঝানোর জন্য। আর বলার ভঙ্গি এমন যে মনে হবে গল্প শুনছি।

অরূপরতন ভট্টাচার্যর বই

কার কেমন আকার ৫·০০

মাপের রকমফের ৬·০০

কেমন করে বছর ঘোরে ৫·০০

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ডায়ারি ৭·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ছটা নটা !

ছোটমাসি চলে যাবার পর, ছোটন অবশ্য রিঙ্কিকে বকেছিল, "বোকার মতো ওকথা বলতে গেলি কেন রে ? বড়রা না থাকলেই তো আমাদের লাভ। মজারুমামাকে বেশি করে পেয়ে যাব ! ওনারা এলে, আর আমরা পাত্তা পাব ?"

রিঙ্কি স্বীকার করেছিল, সত্যিই তার ভুল হয়ে গিয়েছিল। আর তারপর থেকেই 'লাভের' আশায় ছটফটাচ্ছে একগণ্ডা ভাইবোন। মিনিট গুনছে, আর মিনিটে মিনিটে বলছে, 'দূর ছাই, কী যে করছে মজারুমামা।··· বিকেল ছেড়ে সন্ধে পার হয়ে গেল !'

"নাঃ। নো হোপ। আজ আর চান্স নেই !"

"আমাদের কপালটাই খারাপ !"

শেষমেশ রাগে দুঃখে ঘোষণা : "ধেত্তেরি, ভাল্‌লাগছে না, ক্যারমটা পাড়া হোক। পেটা যাক্ !"

সেই ক্যারমে ঘুঁটিগুলি সাজানো হয়েছে মাত্তর, সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং। আর সেই মুহূর্তে ঘরের দরজায় মজারুমামার আর্বিভাব !

একসঙ্গে চারটে গলা চেঁচিয়ে উঠল, "উঃ মজারুমামা ? এতক্ষণে আসা হল ? এই তোমার বিকেল ?···ছোটমাসিরা সিনেমা গেছে, ভাবছিলাম আমরা একা একা তোমার গল্প শুনব।···ইশ্ ! তুমি এলে, আর এক্ষুনি আলোটা নিভে গেল।··· এত দেরি করলে কেন ?"

এতগুলো প্রশ্ন আর অভিযোগের উত্তরে একটি মাত্রই শব্দ উঠল, নাকি-নাকি সুরে, "হাঁউ মাউ খাঁউ ! মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ !"

কিন্তু ভয় পেতে বয়ে গেছে এদের। ছোট দুটোরও নয়। পিঙ্কিসুদ্ধু বলে ওঠে, "ও মজারুমামা, আমরা বুঝি এখনও আগের মতন ছোট আছি যে হাঁউমাউখাঁউ শুনে ভয় পাব ? সেবারের মতো মুখোশ পরে এলেও এখন আর ভয় পাব না। এই ছোড়দা, একটা টর্চ জ্বাল না।"

ছোটন বলল, "টর্চ তো মা'র ঘরে। কে যাবে বাবা ? মজারুমামা, তোমার লাইটারটা জ্বালো না একটু।"

আবার নাকিসুর, "আমাঁর বঁয়ে গেছে।"

"মজারুমামা, যতই তুমি নাকি সুর করো, আমরা ভয় পাচ্ছি না। জ্বালো না বাবা লাইটারটা। ও মজারুমামা, অন্ধকারে বিচ্ছিরি লাগছে ; তোমায় দেখতে পাচ্ছি না।"

হঠাৎ নাকি সুরের বদলে 'পাকি' গলা: "কী ফ্যাচফ্যাচ করছিস, অ্যাঁ ! মজারুমামা আবার কী ? মজারুমামা ! সাতজন্মে এমন কিম্ভূত নাম শুনিনি। কস্মিনকালেও তোদের ওই সব মজারু-শজারুকে চিনি না আমি।"

কিন্তু রিঙ্কি হল গিয়ে দুর্দান্ত মেয়ে, সে ওসব ধমক-টমকে ঘাবড়ায় না। সে হেসে ওঠে, "হি হি হি মজারু শজারু। সাতজন্মেও শোনোনি এমন নাম। তবে তোমার নাম কী শুনি ?"

"আমার নামে তোদের কী কাজ, অ্যাঁ ?"

"আহা ! তোমায় তবে কী বলে ডাকব শুনি ?"

ছায়ামূর্তি বলে, "আমায় ডাকবারই বা কী দরকার ? অ্যাঁ !"

"বা রে, না ডাকলে কী করে গল্প করব মজারুমামা ?"

"খবরদার, ওই সব মজারু-গজারু বলবি না, আমার নাম হচ্ছে, গোকুল গড়াই।"

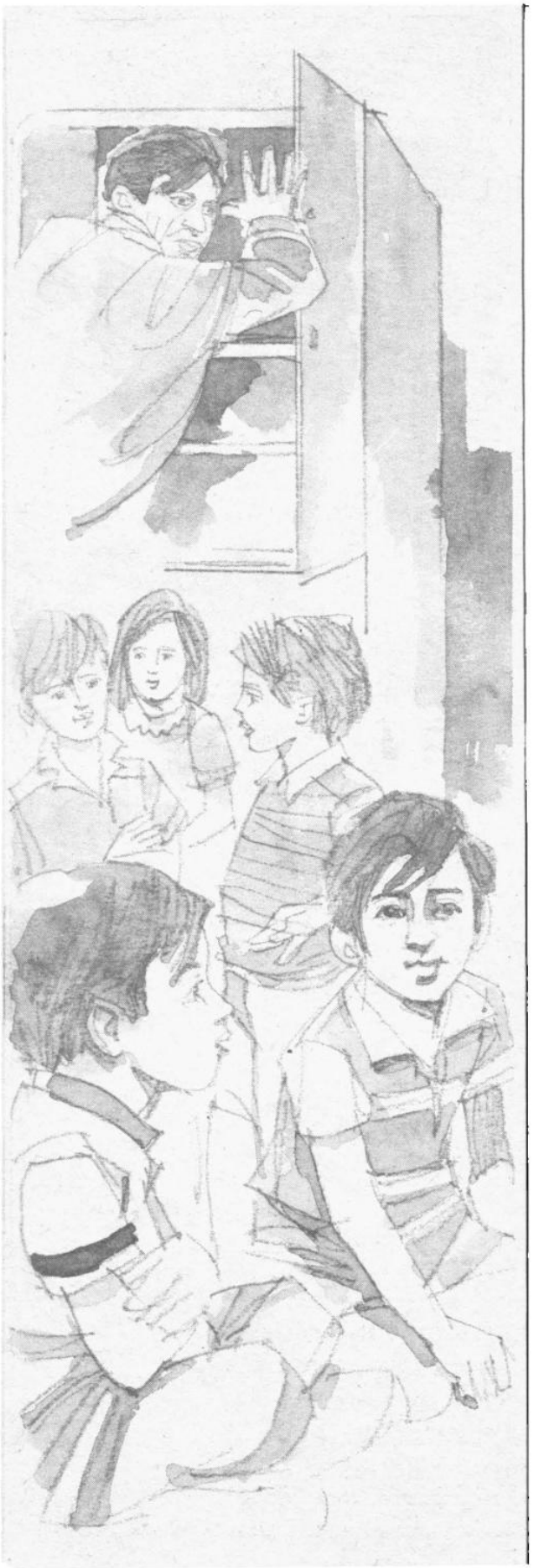

সারা অঙ্গে কোমলতার পরশ

এখন স্নানের পরে এক
কোমলতার নতুন অনুভূতির
জগতে প্রবেশ করুন।
নতুন পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম
সাবানের সমস্ত গুণই ছড়িয়ে
পড়বে আপনার সারা অঙ্গে...
আপনার ত্বককে করে তুলবে
মোলায়েম ও কোমল।

নতুন
পণ্ডস্
কোল্ড ক্রীম সাবান
পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীমের
সমস্ত গুণে ভরা

OBM/3920/BN

"কী ? কী নাম তোমার ? হি হি হি ! আবার বলো না ।"

"বললুম তো ! আমার নাম হচ্ছে গোকুল গড়াই । তবে পাড়ার লোক আড়ালে বলে চোর-গোকলো । বলুক গে । আড়ালে লোকে কী না বলে ।"

"চোর গোকলো ! হি হি হি ! ছোড়দা রে, এবারে মজারুমামার কী মার্ভেলাস স্টাণ্ট । আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, একবার নাকি তুমি 'বকরাক্ষস' হয়েছিলে মজারুমামা ? মা বলে না ছোড়দা ? যতই খাবার দেন সব সাবাড় । আর একবার হয়ো না মজারুমামা । আমি বেশ দেখব ।"

"বটে !" মজারুমামা বলে, "বকরাক্ষস দেখার সাধ ? তা দেখিস । সব সাবড়ে দেব ! এখন সর, আমায় আমার কাজ করতে দে !"

"কাজ ! তোমার আবার কাজ কী মজারুমামা ?"

"এই মেয়েটা তো আচ্ছা ফ্যাচ্‌ফ্যাচানি । চোরের আবার কী কাজ চুরি করা ছাড়া ?"

ছোটন হেসে বলে ওঠে, "তা আলোটা জ্বলুক মজারুমামা । অন্ধকারে তো কিছু দেখতেই পাবে না । কোথাও একটা দেশলাইও খুঁজে পাচ্ছি না । মা না এমন । দেশলাই মোমবাতি টেবিলে রেখে দেবে তো ? আমরা কজন ছোট একা রয়েছি ।"

"হ্যাঁ, তাই তো !"

পিঙ্কি পিনপিনিয়ে বলে, "নিজেরা বেশ মজা করে রোজ-রোজ সিনেমা দেখতে যাওয়া হবে, আর আমরা একা পড়ে থাকব । আবার লোড্‌শেডিং পাজিটাও এসে হাজির হবে । ও মজারুমামা, একবারটি তোমার লাইটারটাই জ্বালো না গো । তোমায় দেখি !"

"লাইটার-ফাইটার নেই আমার ।"

এবারে ফোটন হেসে ওঠে, "তুমি আছ আর তোমার লাইটার নেই, এ হয় মজারুমামা ?··· তা, তোমায় দরজা খুলে দিল কে ?"

হেঁড়ে গলায় মজারুর উত্তর, "আমায় আবার দরজা খুলে দিতে লাগে নাকি ? জন্মে কক্ষনো কেউ আমায় দরজা খুলে দেয়নি, দেয় না দেবেও না । দরকারটা কী ? ছাতের রেনওয়াটার পাইপগুলো তবে আছে কী করতে ?"

"হো-হো-হো, হা-হা-হা, এমন মজার কথা বলো তুমি । আর কতরকম যে গলা করতে পারো ! দূর ছাই ; লোডশেডিংটা আর সময় পেল না । সেই কখন থেকে হাঁ করে বসে আছি তুমি আসবে-আসবে করে । মিনিট গুনছি । কেবল-কেবল রাস্তা দেখছি । আর তুমি···"

"আহা রে, আজ আমার কী ভাগ্য ! সাতজন্মে কেউ কক্ষনো আমার আসার আশায় পথ চেয়ে বসে থাকে না রে । তুই একটু জল খাওয়াতে পারিস ?"

এখন গলার স্বর একটু কম বিকট ।

"জল ? এ মা, শুধু জল ? ফ্রিজে কত কী রয়েছে । এই বিচ্ছিরি অন্ধকারটা হয়েই তো যত জ্বালা । সুশীল ! এই সুশীল !"

মজারু বলে ওঠে, "এই, চোপ, চেঁচাবি না । রাখ তোর সুশীল । আমি নিজেই নিচ্ছি । ওই তো দালানের কোণে তোদের সাধের ফ্রিজ !"

"তা তো তুমি জানোই ! কিন্তু ভীষণ অন্ধকার যে মজারুমামা !"

"নিকুচি করেছে তোদের অন্ধকারের ! অন্ধকারেই আমার চোখে মানিক জ্বলে ।"

দরজার কাছের ছায়াটা নড়ল । অতঃপর এক ঝাপটে ফস করে ছায়াটা সরে গেল ।

ফোটন চেঁচিয়ে উঠল, "ও মজারুমামা, দাঁড়াও, একটা টর্চ পেয়েছি—"

"অ্যাই খবর্দার ! টর্চ-ফর্চ জ্বালবি না ।"

কিন্তু জ্বালবেই বা কী ! এ তো সেই ব্যাটারিফুরনো টর্চটা । বাবা কাল বলেছিলেন, ফোটন, তোর বয়েসে আমি কত কাজ করেছি । আর তুই এইটুকুও পারিস না ? বললাম না কাল, টর্চটায় একটু ব্যাটারি ভরে রাখ ।

বলেছিলেন । যেমন সর্বদাই কত কী বলেন ।

রাখেনি ফোটন । তাই জ্বলল না টর্চ । ওদিকে মজারুমামার বারণও । না জ্বলেছে একরকম ভালই । জ্বললে মজারুমামা রাগ করে চলেই যাবে কি না কে জানে ।

রিঙ্কি দরজা থেকে চেঁচায়, "ফ্রিজ খুলতে পেরেছ মজারুমামা ?"

"ফ্রিজ ! হা-হা-হা । ফ্রিজ খুলতে পারব না ? বলে গডরেজের লকার খুলে-খুলে হাত পাকা । খুলেছি, বেশ ভাল-ভাল সব খাবারদাবার সাঁটছি টপাটপ বকরাক্ষসের মতো ।"

হি-হি-হি । রিঙ্কি হাসে, মালাই চমচম তো ? ভীম নাগের তস্য পৌত্রের জলভরা কড়াপাক ? ··· ছোটমাসির তৈরি ডিমের পাটিসাপটা, আর মার তৈরি কাশ্মিরি গোকুলপিঠে ? সবই বোধহয় তোমার জন্যেই ছিল মজারুমামা । তোমার যখন আসার কথা ! ··· আহা অন্ধকারে খেতে পেরেছ কিছু ?"

দালান থেকে হাসির আওয়াজ, "কিছু কী রে ? এমন সব ভালমন্দ খাবার, কেউ 'কিছু' খেয়ে ছেড়ে দেয় ? সব সাঁটছি । ···আঃ ! তার সঙ্গে বোতলের এই ঠাণ্ডা জল ! অমৃত ! যাক, এবার আমায় আমার কাজ করতে দে !"

ছায়াটা আবার ঘরে ঢুকে এল ।

"মজারুমামা, অত সরে-সরে যাচ্ছ কেন ? ছুঁতে পারছি না, ধরতে পারছি না, কাছে এসো না !"

পিঙ্কি প্রায় কাঁদো-কাঁদো ।

কিন্তু তার মজারুমামার 'মামাত্ব' কই ?

সে তো প্রায় ধমকে ওঠে, "ধরবি ? ধরবি মানে কী ? আজ পর্যন্ত কেউ আমায় ধরতে পেরেছে ? তাই তুই ধরবি ? সর । সবকটা এই দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে থাক । আমাকে একটু নিশ্চিন্দি হয়ে কাজ করতে দে । চটপট সারতে হবে, নাকি তোদের সঙ্গে বাকতালা করব ?"

ফোটন এখন জোর গলায় বলে, "এবার তুমি বড্ড বেশি মজা করছ মজারুমামা ! ভাল্লাগছে না ! কী সব উলটো-পালটা কথা বলছ । জানি না বাবা । অন্ধকার দেখে খুব ঠকাতে ইচ্ছে করছে আমাদের, কেমন ? কেবল বলা হচ্ছে কাজ করতে দে । কাজ আবার কী তোমার শুনি ?"

"শুনবি ? হে-হে-হে ! কাজ হচ্ছে ঘর সাফ করা ।"

রিঙ্কি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, "এ মা, তুমি আবার ঘর সাফ করবে কী ? কেন, সুশীলদা কি, হি-হি-হি, বনবাসে গেছে ?"

পিঙ্কি বলে ওঠে, "বিকেলে তো সাফ করেছে সুশীলদা ন্যাতা নিয়ে বালতি নিয়ে ।"

"সুশীল ? সুশীলের সাফ করার কথা বাদ দে।"

বিজ্ঞের মতো বলে ছোটন, "ছোটমাসি তো বলে তোদের সুশীলবাবু ঘর সাফ করে যায়, বোঝাও যায় না, করেছে কি করেনি। পায়ে খুব ধুলো-বালি কিচকিচ করছে বুঝি মজারুমামা ?"

"ফের মজারু-শজারু ? বলেছি না ওই সব বিটকেল নামে ডাকবি না আমায়।"

"বেশ বাবা, ডাকব না। তো, বাবার হাওয়াই চটিটা এনে দেব তোমায় ? অন্ধকারেও খুঁজে পেতে পারি। দরজার কাছেই আছে।"

"হাওয়াই চটি ! ধ্যেত ! দরকার নেই তোর বাবার চটিতে। তো, বাবা কোথায় ?"

"বাবা তো অফিস থেকে বেরিয়ে সিনেমা হলে এসে জুটবে মা ছোটমাসিদের কাছে। দুটো সিনেমা দেখছে তো ? তিনটে-ছটা, ছটা-ন'টা। তা, শেষেরটায় বাবাকে যেতে হবে। নইলে অত রাত্তিরে ছোটমাসিরা প্রাচী থেকে এই যাদবপুরে ফিরবে কী করে ?"

"হেঁহেঁহেঁ ! ভালই তো। হেঁহেঁহেঁ !" অন্ধকারের মধ্যে নড়েচড়ে বেড়াতে-বেড়াতে মজারু কেমন এক বিটকেল গলায় হেসে ওঠে।

"মজারুমামা ! তুমি অমন বিচ্ছিরি গলায় হাসছ কেন ?" ··· ছোটন সন্দেহ-সন্দেহ গলায় বলে, "এবার বুঝি হরবোলা শিখে এসেছ।"

"কী ? কী বললি ? কী শিখে এসেছি ?"

"হরবোলা গো, না হলে এতরকম গলা করছ কী করে ? কত রকমই যে গলা শুনছি। শুধু তোমার মতনটা বাদে ! বুঝেছি, সেবারে বহুরূপী হতে শিখে এসেছিলে, এবার হরবোলা !"

"অ্যাই ! কী বাজে-বাজে কথা বলছিস ?"

"আহা রে ! বাজে-বাজে বই কী !"

ছোটন বলে, "ছোটকার বিয়ের সময় এসে বহুরূপী হওনি তুমি ? বাবাঃ ! ইয়া মোটকা এক ল্যাজওয়ালা বীর হনুমান সেজে নতুন করে কনের ঘরের মধ্যে ধুপ করে লাফিয়ে পড়ে কী কাণ্ড, কী কাণ্ড ! পিঙ্কিদের হয়তো মনে নেই।"

কিন্তু রিঙ্কি সতেজে বলে, "আমার খুব মনে আছে ! নতুন কাকি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আঁআঁ করছে··· বড়পিসি নতুন বউয়ের চেঁচানো শুনে বক্‌তে এসে নিজেই হাঁক-পাঁক করতে করতে দে-ছুট। মনে নেই আবার ! তোমার মনে পড়ছে না মজারুমামা ?"

"হাঁ। বোধহয় পড়ছে।"

"এ মা ! মনে পড়ার আবার বোধহয় কী ? এমন উৎকট মজার কথা বলো তুমি ! তো তোমার সেই বহুরূপী সাজবার সব ছালচামড়া গোঁফ-দাড়ি ল্যাজ-ফ্যাজ কিছু আনোনি তো ?"

"কী ? ছালচামড়া, ল্যাজ-গোঁফ ? ভাগ্।"

"আহা, ছোটমাসি বেশ দেখত !"

এখন ছায়ামূর্তির গলা থেকে ঠিক ভোম্বলজ্যাঠার মতো গম্ভীর স্বর বেরোল, "এক জায়গায় একই খেলা দেখায় বোকারা, বুঝলি ?"

"বাঃ, ছোটমাসি তো দেখেনি।"

"তোদের ছোটমাসি আরও অনেক খেলা দেখবে।"

"বাবাঃ ! মজারুমামা, তোমার গলাটা ঠিক ভোম্বলজ্যাঠার মতো লাগল। এবারে এই হরবোলাটাই শিখে এসেছ, তাই না ? কী কী ডাক ডাকতে পারো ?" রিঙ্কির গলায় আগ্রহ, উত্তেজনা। "মুর্গির ডাক ডাকতে পারো ? ঘোড়ার ডাক ? কুকুরের কান্না ? রেলগাড়ির ইঞ্জিনের ডাক ? মিনিবাসের হর্নের ডাক ? আমাদের স্কুলে প্রাইজের দিনে না, একজন হরবোলাবাবু এসে—মজারুমামা !"

হঠাৎ থেমে যায় রিঙ্কি। বলে ওঠে, "তুমি আলমারি খুলছ ? কেন গো ?"

"খুলছি, ভাল করে সাফ করে বন্ধ করে দেব বলে। আহা এ বাড়ির গিন্নি কী গুড গার্ল।"

মজারুর গলার স্বর এখন ভোম্বলজ্যাঠার মতো নয়, বরং ছোট্‌কার মতো, মজা-মজা হাসি-হাসি। "আহা ! জগতে যে চুরিটুরি বলে একটা কথা আছে জানেনই না, চোর বলে একটা জিনিস আছে তাও না। বেশ বেশ !"

"হ্যাঁ, বেশ বই কী ! দেখেছিস দাদা, ছোড়দা, মা'র নিজের বেলায় দোষ হয় না, যত দোষ নন্দ ঘোষ আমাদের বেলায় ! আমরা যদি পেনটা কি স্কেলটা, কি মাইনের বইটা একটু এখানে-সেখানে ফেলে রাখি কী বকুনি ! কী বকুনি।···ঠিক আছে মজারুমামা, তোমায় আর বন্ধ করতে হবে না, যেমন ঝুলছে ঝুলুক। এসে নিজের কীর্তিটা দেখুন।"

"তা দেখুন।" মজারু-কণ্ঠ বলে ওঠে, "তবে ভেতরটা সাফ করে ফেলি।"

"অন্ধকারে আবার তুমি কী সাফ করবে মজারুমামা ! যা হাণ্ডুল-মাণ্ডুল হয়ে আছে। হবে না ? বলে ছোটমাসির মার্কেটিং ! যখন ইচ্ছে, আর যত ইচ্ছে শাড়ি কিনে আনছে, আর আলমারিতে ঠুসছে। ছোটমাসিদের ওখানে নাকি বাংলা সিনেমাও নেই, বাংলা শাড়িও নেই। তাই কলকাতার সব শাড়িগুলো কিনে নিয়ে যাবার তাল। আচ্ছা, নিয়ে যাবে কী করে বল তো ?"

"সেই তো !" মজারু বলে ওঠে, "সেটাই তো সমস্যা। ঢাউস একটা স্যুটকেস তো এনেছে মনে হচ্ছে, তা সেটাও তো বোঝাই ! কিসে কী নিয়ে যাওয়া যাবে !"

"ওমা ! ছোটমাসি যে একটা ঢাউস স্যুটকেস এনেছে, তুমি জানলে কী করে ? সে তো ও-ঘরে।"

"কী করে জানলাম ? হে-হে-হে, জানিস না অন্ধকারে আমার চোখে মানিক জ্বলে, আর হাত না দেখেও আমি গুনে বলতে পারি। স্যুটকেসটা চাকা লাগানো তো ? ভারী খাসা জিনিস। যত ভারীই হোক গড়গড়িয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।"

"ঠিক, ঠিক। কী দারুণ ! ও মজারুমামা, তা হলে হাত গুনে বলে দাও না গো আমার রেজাল্টটা কী হবে !"

"দূর বাবা ! এ তো আচ্ছা মেয়ে ! যেমন একজামিন দিয়েছিস, তেমনি রেজাল্ট হবে। আবার কী ?"

"আঁ, আঁ, আঁ ! ও ছোড়দা দ্যাখ না—"

রিঙ্কির গলা আকাশে ওঠে, "মজারুমামা আমায় রাগাচ্ছে। আমি বুঝি খারাপ পরীক্ষা দিয়েছি ?"

"অন্ধকারে তীর-ছোঁড়াছুঁড়ি।"

"অ্যাই ! চোপ্ ! আমি বলেছি খারাপ দিয়েছিস ? বলেছি, যেমন দিয়েছিস ! আমি বেটা চোর-গোকলো ওসব

রেজাল্ট-ফেজাল্টের কী বুঝি ?"

"চোর-গোকলো !" ফোটন বলে ওঠে, "ওঃ মার্ভেলাস ! দারুণ একখানা নাম আবিষ্কার করেছ বটে মজারুমামা ! মাথায় এলও তো !"

ফোটন এতক্ষণ বিশেষ কথা বলছিল না। কেবল অন্ধকারেই এখানে-সেখানে, তাকে, জানলার ধারে, বইয়ের শেলফে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল একটা দেশলাই আর মোমবাতির টুকরো-ফুকরো পায় কি না। কত সময়ই যে এরকম পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু দরকারের সময় ? নেভার ! এখন হতাশ গলায় বলল, "এই, মজারুমামাকে এত জ্বালাতন করছিস কেন ? ইচ্ছে হলে মজারুমামা অন্ধকারেও গল্প বলতে পারে। তাই না মজারুমামা ?"

"হুঁ ! বলব। অপারেশানটা শেষ হোক ! তারপর।"

"অপারেশন কী ? অ্যাঁ ! ও মামা ! হঠাৎ অপারেশনের কথা কেন ? কিসের অপারেশন ? কার অপারেশন ?"

"কেন, কিসের, কার ?" সেটা পরে বুঝবি !"

"জানি না বাবা ! ও সব বুঝতে-টুঝতে চাই না। আমরা তোমায় ধরছি রোসো।"

কলকলিয়ে ওঠে সবকটা। বলে, "এই শোন, মজারুমামা আলমারির কাছে, আয় সবাই মিলে ধরে ফেলি !"

"এই যে এটা কার হাত ? ধ্যেত। এ তো ছোটনের। এই, এই যে পিঠ না তো ! মজারুমামা তুমি শার্ট পরেছ না পাঞ্জাবি ? এই যে ··এই যে···ধরেছি !"

"অ্যাই ! অ্যাই ! ফোঁড়া ! ফোঁড়া !"

"ফোঁ-ড়া !"

সব কটা হাত নিজের-নিজের দুপাশে ঝুলে পড়ল।

মজারু নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে বলে, "সর্বাঙ্গে ফোঁড়া। বুঝলে হে ভাগ্নে-ভাগ্নিরা ! চেপে ধরলেই রক্ত-ফক্ত। দ্যাখো, কারুর হাতে-টাতে লেগে গেল কি না।"

ততক্ষণে চার-দুগুনে আটখানা পা পিছু হাঁটতে-হাঁটতে একেবারে ওদিকের দেয়ালে সেঁটে গেছে। আর দেখছে হাত ভিজে-ভিজে কিনা।

তবু কথা কয়ে উঠল ছোটন, "ওঃ, তাই তুমি অপারেশনের কথা বলছিলে ?"

"হেঁহেঁ, ঠিক বুঝেছিস তো ! যাক এবার তাহলে—"

এই সময় পিঙ্কি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, "আলো কি আজ আসবে না ? মা কি আজ আসবে না ?"

ফোটন বলে উঠল, "ধ্যেত, কাঁদছিস কেন ?"

"আমার ভয় করছে। আমার কান্না পাচ্ছে ! আমার মজারুমামাকে ভূত মনে হচ্ছে !"

"কী বললি ? বাঃ। ঠিকই বলেছিস। এ ব্যাটা তো একটা ভূতই ! গোভূত। হাম্বা-হাম্বা খাম্বা-খাম্বা, হাঁউ-মাউ-খাঁউ !"

"আঁ আঁ আঁ।" পিঙ্কি কেঁদে ওঠে।

অন্ধকার ভেদ করে আবার সেই বিকট গলা, "অ্যাই, চোপ ! এক চড়ে কান্নাকে বিন্দাবনে পাঠিয়ে দেব। মেয়ে না তো, সানাইবাঁশি ! ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। দেখি কোথায় কী—"

ভয় খেয়ে পিঙ্কি কান্নাটা গিলে ফেলে। আর বাকি তিনজন হাঁ-হাঁ করে ওঠে, "ও মজারুমামা, না না, যেও না গো, ছোটমাসি তাহলে আমাদের বড় ঘেন্না দেবে। বলবে, 'এইটুকু

শুধু সুধীর নয়... এখন মিঃসুধীর, সেল্‌স্ এক্সিকিউটিভ!

জীবনের প্রথম চাকরী, গর্ব করার মত সেই মূহূর্ত...আর, জীবনের প্রথম রোজগারও তো! নিজেকে এখন আপনার নতুন মানুষ মনে হয়...একটি ঘড়ি কেনারও এই তো সময় — এমন এক 'সময়' যা আপনার পয়সার মূল্য উশুল ক'রে দেয় — কিনুন একটি এইচ এম টি...হবে গর্ব করার মতই সে শুভক্ষণটি!

এইচ এম টি নিয়ে এসেছে, আপনার বেছে নেওয়ার মত ১২০টি মডেলের সম্ভার! নির্ভরযোগ্য, শক্তপোক্ত, নিখুঁত আর সময়ও সদা নির্ভুল যার!

যে শুভক্ষণটি কর্মজীবনে আনে উন্নতি বারবার!

ওয়াচ ডিভিশন
hmt
জাতীয় সময়রক্ষী
কারখানা:
ব্যাঙ্গালোর (১ এবং ২).
শ্রীনগর, টুমকুর।

hmt ঘড়ি
তৈরী হয়েছে আপনারই জন্যে!

CLARION/HMT/84196/BEN

আর বসিয়ে রাখতে পারলি না ? বলে গেলাম ।' মজারুমামা, তোমার পায়ে পড়ি—"

"ফের ! ফের মজারু ? ঠ্যাং ধরে আছাড় মারব এক-একটাকে ! বলছি আমি হচ্ছি চোর-গোকলো, কোনো জন্মে কারুর মামা-ফামা নই ।"

হঠাৎ সবাই চুপ করে যায় ।

অন্ধকারের মধ্যে নেমে আসে একটা স্তব্ধতা ।

আর একটু পরেই সেই অন্ধকার ভেদ করে বেশ দিলখোলা এক হা হা হাসি ওঠে ।

"খুব ভয় পেয়ে গেছিস তো ? নাঃ, তোরা বাবা খুব চালাক ছেলেমেয়ে, কিছুতেই ঠকানো গেল না । পরীক্ষায় ফার্স্ট তো ! তা বোস, অন্ধকারে বসে গল্পই শোন্ একটা । তোদের ছোটমাসি তো সেই ছটা-নটা !"

ভারী মোলায়েম গলা এখন মজারুর ।

ওঃ । বুকের পাহাড় নামল !

এতক্ষণ ধরে তবে এদের বুদ্ধির পরীক্ষা চলছিল । মজারুমামা, যত পারে ঠকাবার চেষ্টা করছিল ! "হুঁ বাবা, আমাদের আর ঠকাতে হয় না ।"

অতএব সমস্বরে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, গল্প গল্প ! ততক্ষণে মা-ছোটমাসিরা এসে যাবে !"

"বেশ, কিসের গল্প শুনবি !"

"ভূতের, ভূতের !" ফোটন আর ছোটন বলে ওঠে ।

কিন্তু পিঙ্কি আবার পুরনো রেকর্ড চাপায় । "নাঁ, নাঁআঁ । আমার ভয় করছে !"

"ধ্যেত, একটা ভিতুর ডিম ।" রিঙ্কি বলে ওঠে, "ওটাকে নিয়ে পারা যায় না ।"

"তাহলে ? রাজা-রানির ?"

"এ মা ! রাজা-রানির কী ? আমরা কি বাচ্চা ?"

"তাহলে ? চোরের ?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, চোরের, চোরের ! কী রে পিঙ্কিখুকি, চোরের গল্পেও ভয় পাবি না তো ?"

পিঙ্কি চোখ মুছে বলে, "না !"

"তবে শোন । এক গ্রামে এক চোর বাস করত । ভারী ভদ্দরসজ্জন লোক ! ওই চুরিটি ছাড়া আর কোনো দোষ ছিল না তার ।"

"আহা, চোর আবার ভদ্দরসজ্জন কী গো ?"

"কেন ? হতে নেই ? চুরিটা তার সাতপুরুষের পেশা । বাপ-ঠাকুর্দার কাছে আর-কোনো বিদ্যে শেখেইনি । তা ভদ্দর-সজ্জন হতে বাধা কী ? তা যা করত নিয়ম-কানুন মেনেই । রাত বারোটা বাজলেই সিঁদকাঠিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়া, আর ঠিক রাত চারটের মধ্যেই কাজকর্ম সেরে, ফিরে এসে পাতা-বিছানায় শুয়ে পড়া ।

"চৌকিদারদের ডিউটির টাইম হচ্ছে রাত পৌনে বারোটা, আর ভোর সাড়ে চারটে ।

"পৌনে বারোটায় চৌকিদার জানলার বাইরে হাঁক পাড়ত : 'গণেশদাস হো !'

"চোরমশাই সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিত, 'আছি আজ্ঞে । তামাক খাচ্ছি ।'

'তামাক খাচ্ছিস তো ধোঁয়া কই ?'

"চোরমশাই মুখে কালিঝুলির আঁক কাটতে কাটতে বলত, 'আজ্ঞে টিকে ভিজে গেছে ।'

'ঠিক হ্যায় ! ঘুমো ব্যাটা !'

"আবার চৌকিদারটা ভোর সাড়ে চারটের সময় এসে বাইরে থেকে হাঁক পাড়ত, 'গণেশদাস হ্যায় !'

"গণেশদাস তেল-ন্যাকড়া দিয়ে মুখের কালিঝুলি মুছতে মুছতে বলত, 'আজ্ঞে আছি বই কী ! বিড়ি খাচ্ছি ।'

'কেন ? কেন ? এত রাত্তিরে বিড়ি খাচ্ছিস কেন ?'

'আজ্ঞে জেগে থাকতে !'

"চৌকিদার বলত, 'কেন ? জেগে থাকার দরকার ?'

'এই আপনার ডাকে সাড়া দিতে । সাড়া না পেলেই তো কাল সকালে এসে চালান দিবেন ।'

'হা-হা-হা ! তা দিব । তবে দে, দুটা বিড়ি দে ।'

"জানলা দিয়ে হাত বাড়াত ।

"কিন্তু এত সাবধানেও কপালের ফেরে একদিন দুপুররাতে সিঁদকাঠি হাতে ধরা পড়ল গণেশদাস । বাস, দশ বছর জেল ।"

"দ-শ বছ-র !"

"ওই তো মজা, তল্লাটের যেখানে যত চুরির কাণ্ড ঘটেছে, সব কেস তার নামে । রেগে-মেগে গণেশদাস জেলে ঢোকার আগে তার ছেলেকে বলে গেল, 'তুই আর রাতের কারবারে যাসনে ! যা করবি দিনেমানে !'"

"এই বাবা ! তার ছেলে চোর নাকি ?"

"তা হবে না ? চোরের ব্যাটা চোর না হয়ে কি পুলিশ হবে ? বললুম না সাতপুরুষের পেশা । চুরি না করে উপায় কী ? ওই বিদ্যেটি ছাড়া আর তো কিছু শেখেনি । বাপ বলল, 'রাতের কারবারেই যত ফ্যাসাদ ! দিনে-দুপুরে ভাল-ভাল জামা-জুতো পরে পাঁচজনের মাঝখানে ঘুরতে-ঘুরতে কাজ সাফাই করে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পাবলিকের ভিড়ে মিশে যাবি । বাপ-ঠাকুর্দার মতন কুচিয়ে চুল ছাঁটতে হবে না । গায়ে প্যাচপেচিয়ে তেল মাখতে হবে না, মুখে কালিঝুলি মাখতে হবে না, তুই বা কে, রাজপুত্তুরই বা কে । শহরবাজারে এখন এই রেওয়াজ হয়েছে !'

"তা বাপ জেলে ঢুকে যাবার পর ছেলে সেই রেওয়াজে কাজ চালায় । তোফাই চালায় । হাল ফিরে রাজার হাল ! দিনমানে গটগটিয়ে ঢুকে আসে, দোকানে বাজারে লোকের বাড়িতে । চোখ রাঙিয়ে, মাল হাতিয়ে বেরিয়ে আসে । ট্যাক্সি ডেকে মালপত্তর চাপিয়ে হাওয়া হয়ে যায় । বেশ চলছিল..."

মজারুমামা একটু থেমে বলে, "কপালের ফেরে একদিন হল এক বিপত্তি ! বাঘা-বাঘা পুলিশদাদারা যাকে জব্দ করতে পারে না, সেই লোক কিনা দুটো কুচোকাচা ছেলেপেলের কাছে জব্দ বনে বসল । সব গুবলেট ।"

"কী মজা ! কী মজা !"

চটাপট হাততালি ।

"ওরা বুঝি বুদ্ধি করে চোরটাকে ঘরে বন্ধ করে ফেলল ?"

"ঘরে বন্ধ ?" গল্প-বলিয়ে মজারু জোর গলায় বলে, "নিকুচি করেছে তোদের ! ঘরে বন্ধ আবার একটা ব্যাপার । কেন, জানলার গ্রিল ওপড়ানো যায় না ? শিক ভাঙা যায় না ? আর বুদ্ধি ? বুদ্ধিই বটে ! যেন সবকটা এইমাত্তর স্বর্গ থেকে খসে পড়েছে ।... ওসব কিছু না । কপালের ফের ! তা একদিন দিনের বদলে সন্ধে, আর মক্কেলের বাড়ি ঢোকামাত্তর

লোডশেডিং।"

"অ্যাঁ!"

"য্যাঃ!"

"ধ্যাত!"

"তুমি বুঝি বানাচ্ছ মজারুমামা?"

"বানাচ্ছি মানে? লোডশেডিং বলে কোনো জিনিস নেই? দেখিসনি কখনো?"

"না না, তা বলছি না!"

"বলছিস না তো চুপচাপ থাক! লোডশেডিং। তায় আবার আকাশে মেঘের ঘটা। সেকেলে চোরের মায়েদের ভিরকুট্টির অবস্থা! চোখ রাঙালেও দেখানো যাচ্ছে না। বাড়িতে গার্জেনরা সব হাওয়া। কিন্তু বাড়িতে রেখে গেছে ওই সর্বনেশে ডেঞ্জারাস কুচোকটাকে। ...ব্যাস। সবকটা একসঙ্গে ছিনে জোঁকের মতো লেগে থেকে চোরটাকে কিমা বানিয়ে ছাড়ল।"

"অ্যাঁ! কিমা!"

"সরি, কিমা নয়, মামা, মামা! তো চোর বেটার কাছে দুইই সমান। তিনকুলে যার একটাও বোন নেই, তাকে যদি গণ্ডাখানেক ভাগ্নে-ভাগ্নি রসোমালাই, ডিমের পাটিসাপটা, কাশ্মিরি গোকুলপিঠে খাওয়াতে বসে, আর মামা-মামা করে জীবন মহানিশা করে ছাড়ে, সেটা কিমা বানানো ছাড়া আর কী? কাজেই চোরটা..."

"ও মজারুমামা, গল্পটা তুমি বানাচ্ছ নাকি?"

"বানানো মানে? চোরটা যা করল, তাই বলছি। বিলকুল সত্যি!"

"কী করল গো?"

"কী করল? অনেক কষ্টে হাতানো মালপত্তরগুলো ছড়িয়ে ফেলে রেখে এমনি করে গটগট করে বেরিয়ে চলে গেল!"

"এ কী! এ কী! তা, তুমি চলে যাচ্ছ কেন?" ও মজারুমামা, গল্পটার শেষ কী?"

আর শেষ! ছায়ামূর্তির টিকির ছায়াটিও নেই।

আর শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। ঠিক সেই মুহূর্তে কারেন্ট এসে গেল! বাড়ি আলোয় ঝলমল!

"ফোটন!"

"ছোটন!"

"ছোড়দা রে!"

"রিঙ্কি রে!"

"বারান্দায় ঝুঁকেও দেখতে পেলাম না রে দাদা।"

"আচ্ছা, আমরা কী দোষ করলাম বল তো?"

"কী জানি বাবা!"

"এবারে বোধহয় শরীর ভাল নেই মজারুমামার।"

"না রে। বোধহয় ছোটমাসিরা নেই বলে রাগ হয়েছে!"

"হতেই পারে।"

"কিন্তু এ কী?"

"এসব কী?"

"দালানে এসব কোত্থেকে এল?"

"এসব কী? এ-সব কী?"

বাইরের দরজা থেকে চেঁচাতে-চেঁচাতে আসছেন ফোটন কোম্পানির মা-বাবা-মাসিরা। "এর মানে কী? রাস্তার দরজা হাটপাট!" "সুশীল নিজের দরজায় ছেকল তুলে দিয়ে হাপিস!" "কী, হাপিস নয়? ঘরের মধ্যে বন্দী তুই?" "কী ব্যাপার? সিঁড়ি থেকে জিনিস ছড়ানো—এত দুষ্টুমিও মাথায় খেলে ওদের।"

চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে আসেন ওঁরা। "এ কী! এ কী!"

তবে ওঁদের চেঁচানোয় কর্ণপাত না করে একগণ্ডা গলা চেঁচিয়ে উঠল, "এতক্ষণে আসা হল তোমাদের? এই একটু আগে চলে গেল মজারুমামা!"

"চলে গেল!"

"তা যাবে না তো কী? তোমরা আসবে না, আলো আসবে না, ভাল্লাগে?"

"কিন্তু এসব কী?"

বড়-ছোট দুই বোন দালানে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, "কিন্তু এসব কী ব্যাপার। ওরে বাবা, আমার স্যুটকেসটা সিঁড়ির ধারে কেন? আলনার জামা-কাপড়গুলো মাটিতে জড়ো করা কেন? টেপ-রেকর্ডারটা দেরাজ থেকে বেরিয়ে এখানে এল কীভাবে? ফ্রিজটা হাঁ করে খোলা মানে কী? ওরে বাবা রে, মেজদি, আমার নতুন কেনা শাড়িগুলো বাজারের থলের মধ্যে ঠোসা! আমার যে মাথা ঝিমঝিম করছে গো।"

বলতে বলতে ঘরে। এবং আর-একপ্রস্থ চিৎকার। "এ আবার কী? আলমারি ফাঁকা করে সর্বস্ব মাটিতে নামানো। ওরে সর্বনেশে ছেলেমেয়েরা, কী যে হচ্ছিল তোদের? রাম-রাবণের যুদ্ধ, না কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড।"

বাবা গম্ভীরভাবে বলেন, "দেখে মনে হচ্ছে তৃতীয় মহাযুদ্ধের পত্তন এইখান থেকেই হল! দস্যিপনার একটা সীমা থাকবে তো?"

মা'ও বলে ওঠেন, "সত্যি! হাঁ হয়ে যাচ্ছি।"

কিন্তু রিঙ্কি তো আর ছেড়ে কথা বলবার মেয়ে নয়। সে নিজস্ব স্টাইলে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, "আহা রে। আমরা এইসব করেছি! আমাদের ভারী সাহস! এ সবই তোমাদের মজারু-ভাইয়ের গজারু কাণ্ড! অন্ধকারের মধ্যে উনি ঘরবাড়ি আলমারি দেরাজ সব সাফ করছেন! হি-হি, আবার তিনি 'চোর-গোক্‌লো' হয়ে মালপত্তর হাতাচ্ছেন! উঃ, কম কাণ্ড করেছে মজারুমামা আমাদের ঠকাতে? হরবোলা হয়ে দশরকম গলা করেছে। কিন্তু পারল তো ঠকাতে? আমরা তেমনি বোকা নাকি? শেষ অবধি তোমাদের দেরি-ফেরি দেখে হঠাৎ রেগে গটগট করে চলে গেল। তবে খুব ভাগ্যি, ফ্রিজের খাবারগুলো সেঁটে গেছে চেটেপুটে।"

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কোন্‌টি? মাউন্ট এভারেস্ট? ভুল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় আছে একটি আগ্নেয়গিরি, পাদদেশ থেকে মাপলে যার উচ্চতা ন' কিলোমিটার, অর্থাৎ এভারেস্টের চেয়ে এক কিলোমিটার বেশি।

শেষ পেশোয়ার অন্তিম

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

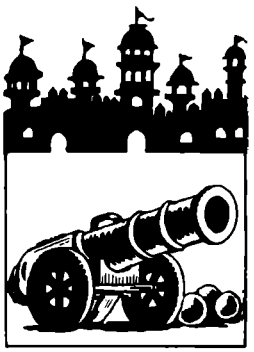

১৮১৮ সালে লর্ড হেস্টিংস যখন বড়লাট তখন দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পেশোয়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মারাঠা যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি স্যার জন ম্যালকমের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

স্যার জন ম্যালকম তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপরের মহলে বিশ্বস্ত কর্মচারী। তিনি সরকারি দূত হয়ে দু'বার পারস্য দেশে গিয়েছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। ইতিহাসের দুটি বই লিখেছিলেন, একটি পারস্যের ইতিহাস, আর একটি ভারতবর্ষের ইতিহাস। দুটি বই-ই বিখ্যাত।

পেশোয়ার সঙ্গে কোম্পানির শর্ত হয়েছিল যে, তিনি আর দাক্ষিণাত্যে ফিরতে পারবেন না, উত্তর ভারতবর্ষে কোনো জায়গায় বসবাস করতে হবে। কোথায় থাকবেন এই প্রশ্ন নিয়ে কিছুদিন আলোচনা চলেছিল। একবার কথা হয়েছিল যে, তিনি বারানসী কিংবা মথুরায় থাকতে পারেন। বাজীরাও রাজি হলেন না। তিনি বললেন, তীর্থস্থানে থাকলে তাঁকে দিনে দু'তিন বার স্নান করতে হবে। তাঁর যা শরীর, তাতে এতবার স্নান করে তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না।

শেষ পর্যন্ত বিঠুরে গিয়ে তিনি বাস করবেন ঠিক হল। বিঠুর কানপুর থেকে মাইল দশেক দূরে। সেখানে থাকবার জন্য তাঁকে একটি জায়গির দেওয়া হল। তাঁর সঙ্গে অনেক লোকজন এসেছিল। বাজীরাওয়ের ভাতা কী হবে ? এই নিয়ে বহু আলোচনার পরে ঠিক হল : বার্ষিক আট লক্ষ টাকা।

কেউ কেউ বললেন, এ তো অনেক টাকা। এত টাকা দেবার কোনো মানে হয় না। স্যার জন ম্যালকম বললেন, তা হোক, হাজার হলেও এক সময়কার পেশোয়া তো। আর তা ছাড়া আট লক্ষ টাকা শুনতে বেশি বটে, কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে এমন কিছু বেশি নয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এ-টাকা দেওয়াই উচিত। তাঁর যা শরীরের অবস্থা, কদিনই বা বাঁচবেন। বাজীরাও তাঁর বন্ধুবান্ধব, অনুচরদের নিয়ে বিঠুরে এসে বাসা বাঁধলেন। বিঠুরের পুরনো নাম 'ব্রহ্মাবর্ত'। পণ্ডিতরা বলতেন যে, বিঠুরের সামনে গঙ্গানদী হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। এ-কথা ভাল করে বোঝবার জন্য বিঠুরের ঘাটের কাছে জলের মধ্যে একটি জায়গা লোহার তার দিয়ে ঘেরা আছে। পেশোয়া এবার নদীতে স্নানে তাঁর আপত্তির কথা তোলেননি। পেশোয়ার সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর পুরনো দেওয়ান রামচন্দ্র পন্ত। তিনি নিজেই প্রভুর সঙ্গে নির্বাসন নিয়েছিলেন।

নতুন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পেশোয়ার খুব অসুবিধা হয়নি। উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও তাঁর আর ছিল না। দান-ধ্যান করে তাঁর সময় কাটত। চারদিকের ব্রাহ্মণরা জানতেন যে, তিনি পেশোয়া না-থাকলেও তাঁর টাকাপয়সার অভাব নেই। ইচ্ছা করলেই অনেক টাকা দান করতে পারেন। ইংরেজরাও হয়তো চেয়েছিলেন যে, এই সব নিয়ে পেশোয়া তাঁর আগের জীবন ভুলে থাকতে পারবেন। ব্রাহ্মণদের অনেক টাকা দিতেন। নানারকম ধর্মীয় আচার পা করতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে পুণ্যবান মনে করা ঠিক র না। আসলে বাইরের ধর্মাচরণে ত্রুটি না-থাকলেও তাঁর নিজের চরিত্রে অনেক দোষ ছিল। তাঁর ধর্মীয় আচরণ কী রকম ছিল সে সম্বন্ধে একটি গল্প বলি। পেশোয়ার বৃত্তির টাকা কানপুর থেকে আসত মিছিল করে। পেশোয়ার একটি সুন্দর পালকি ছিল, মখমল কিংখাব এই সব দিয়ে ভিতরটা সাজানো। টাকা আনবার সময় এই পালকি ব্যবহার করা হত। একবার টাকা ভর্তি এই পালকি একজন ছুঁয়ে দিয়েছিল। বাজীরাও বললেন যদি নিচু হাতের ছোঁয়া লেগে থাকে তাহলে পালকি তো অপবিত্র হয়েছে। দোষ স্খালনের, জন্য টাকাসুদ্ধু পালকিটিকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখা হল। তারপর যখন উপরে তোলা হল, দেখা গেল পালকির সাজসজ্জা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তখনকার টাকা তো রুপোর, কাজেই টাকার কিছু হয়নি। শুধু গঙ্গাজলে কিছুক্ষণ ডুবে থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছে।

পুজোআর্চা, দান-ধ্যান ছাড়া বাজীরাওয়ের আর কোনো কাজ ছিল না। নিরবচ্ছিন্ন আলস্য ও আরামে শরীর ভাল থাকে না। কিন্তু বাজীরাও এইভাবে থাকতেই ভালবাসতেন। পূর্বে দশহরার ঠিক পরে মারাঠি সৈন্যরা যুদ্ধ করতে বের হতেন। তখন বৃষ্টি থেমেছে, অশ্বারোহীর পথে অসুবিধা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ছত্রপতি শিবাজির সময় থেকে এই রীতি চলে আসছিল। এখনও যাঁরা ঐতিহ্য মেনে চলতে চান, তাঁরা দশহরার দিন বিকালে গ্রামের বাইরে হেঁটে যান। পুনের কাছে দেখেছি একরকম ছোট গাছ আছে, সেই গাছের পাতা ছিঁড়ে আনতে হয়। তার অর্থ : শত্রুর দেশ থেকে সোনা জয় করে আনা হল। বাজীরাও আস্তে-আস্তে এই প্রথাও ছেড়ে দিলেন। এমনকী, ঘোড়াও চড়তেন না। কোথাও যেতে হলে পালকি ব্যবহার করতেন।

বাজীরাওয়ের শরীর যখন ভেঙে পড়ছে, তখন কমিশনারের হুকুমে তাঁর জিনিসপত্রের একটা ফর্দ করা হল। ঠিক হল, পেশোয়ার মৃত্যু হবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রাসাদের যে-অংশে ধনরত্ন রাখা হয়, সেই অংশ বন্ধ করে রাখতে হবে, সেই সঙ্গে কড়া পাহারার ব্যবস্থা। তাঁর সম্পত্তি মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের বিতরণ করা হবে। এ তাঁর নিজের সম্পত্তি।

পরের বছর বাজীরাওয়ের পক্ষাঘাতের আক্রমণ হল, কিন্তু ক্রমে তিনি অনেকটা সেরে উঠলেন। ছ'বছর পরে, ১৮৪৭ সালে কমিশনার সরকারকে জানালেন, বাজীরাওয়ের বয়স এখন ৭৩ বছর, খুব দুর্বল, দৃষ্টিশক্তি গিয়েছে। তবু আরও প্রায় চারবছর তিনি বেঁচে ছিলেন। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কানপুর থেকে দু'জন ইংরেজ ডাক্তার তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁরা পরীক্ষা করে বললেন, বাজীরাওয়ের অবস্থা খুব খারাপ। তবে ঠিকমতো চিকিৎসায় তিনি এবারও বেঁচে যেতে পারেন। সেই

কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি সার্ফ কেনেন!

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কারণ সার্ফ-এর ওপর খরচ হওয়া একেকটি পয়সা তার প্রভাব দেখিয়ে দেয়। সেজন্যে, যদি আপনি দিলদরিয়া হয়ে খরচ না ক'রে একটু চোখ খুলে খরচ করেন, তাহলে সার্ফ-ই কিনবেন।"

কিন্তু, সস্তার পাউডার কেনায় তো পয়সার দারুণ সাশ্রয় থাকে!

"একদম নয়, কারণ সস্তার জিনিষ আর ভাল জিনিষ কেনায় তফাৎ থাকে। সার্ফ-এর সঙ্গে সস্তার পাউডার কি মোকাবিলা করতে পারে? মেপে-জুপে হিসেব করলে দেখবেন, সার্ফ কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

সার্ফ কেনাই কেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

"তাহলে শুনুন, সস্তার পাউডারের পুরো এক কিলোর থলিতে যতটা পাউডার থাকে, সার্ফ-এর শুধু ১/২ কিলোর ডিবেতে থাকে ঠিক ততটা পাউডার।"

কিন্তু তবু ...

"প্রশ্নই ওঠেনা—কারণ, সবদিক দিয়ে সার্ফ-এর পাল্লাই ভারী হবে। তাছাড়া, যে কোনো সস্তার পাউডার কি সার্ফ-এর মত কাপড়ে এমন শুভ্রতা আনতে পারে? রঙীন কাপড়ে আনতে পারে এমন ঝলমলে চমক? শুধু সার্ফ-ই এক এমন পাউডার, যা দিয়ে ধুলে কাপড় দেখায় সদা নতুনের মত ...বারবার ধোয়ার পরও।"

আপনি ঠিকই বলেছেন ...

"আর হ্যাঁ, সার্ফ আমার ত্বকেরও কোনো ক্ষতি করে না—মানে, আমার হাত থাকে একেবারে সুরক্ষিত।"

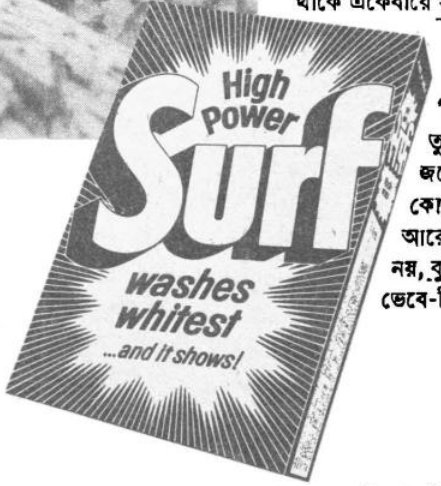

এবার বুঝলাম, সার্ফ লাভের সওদা কেন?

"সত্যি, তাইতো মাসে মাসে তুচ্ছ কয়েকটা পয়সা বাঁচানোর জন্যে সার্ফ-কে আমি কোনোমতেই ছাড়তে রাজী নই। আরে ভাই, পয়সা বাঁচানোই নয়, বুদ্ধিমানের কাজ হ'ল ভেবে-চিন্তে খরচ করা।"

মেপে-জুপে সব যাচাই করলাম, সার্ফ-এর সওদাই সেরা মানলাম।

LINTAS SU 320 2619 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

রাত্রে মনে হল বাজীরাওয়ের অন্তিম সময় উপস্থিত। কানপুর থেকে কমিশনার এলেন। তাঁর মনে হয়েছিল তখনই বিপদের আশঙ্কা নেই। তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি। পরদিন ২৮ জানুয়ারি সকালে বাজীরাও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

বিঠুরে শেষ পেশোয়ার জন্য যে ব্যবস্থা ছিল, তাড়াতাড়ি তা গুটিয়ে ফেলা হল। অল্পদিন পরেই বিঠুর খালি হতে আরম্ভ করল। বাজীরাওয়ের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তাই দুই দত্তকপুত্র নিয়েছিলেন : ধন্দুপন্ত নানাসাহেব ও দাদাসাহেব। নানাসাহেব আশা করেছিলেন, তাঁকে সরকার কিছু ভাতা দিতে পারেন। সে-আশা সফল হয়নি।

পেশোয়াকে যখন ভাতা দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তখন সবাই ভেবেছিলেন তিনি বেশি দিন বাঁচবেন না। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তিনি আরও ৩৫ বছর বেঁচেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা ভাবতে শুরু করলেন, এত বেশি টাকা বৃত্তি দেওয়াই ভুল হয়েছিল। কিন্তু কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন, তিনি যে এতদিন বেঁচে আছেন সেও যেন স্যার জন ম্যালকমের দোষ। তাঁর কথাতেই এত টাকা দিতে হল। অনেকদিন না-বাঁচলে কোম্পানির এত টাকা খরচ হত না। বাজীরাওয়ের খবরদারি করবার জন্য কমিশনার-পদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রথম কমিশনার ছিলেন স্যার জন লো। মারাঠা যুদ্ধের সময় বাজীরাওয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। প্রথম কমিশনারের কাজ কঠিন ছিল। কিন্তু অনেকটা তাঁর জন্যই বাজীরাওকে বন্দীদশা মানিয়ে নেওয়া সহজ হয়েছিল।

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, এই কারণে স্যার জন লো ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। প্রথমে গিয়েছিলেন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে, যেখানে কিছুকাল আগে নেপোলিয়নকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সেখানে যিনি নেপোলিয়নের খবরদারি করতেন, তাঁর নামও ছিল লো। স্যার হাডসন লো। তাঁকে নেপোলিয়ন একদম পছন্দ করতেন না। তিনি এলেই তাঁকে বলে পাঠানো হত, "এখন দেখা হবে না, সম্রাট স্নানের ঘরে আছেন।" জন লো'র সঙ্গে পেশোয়ার সম্পর্ক অবশ্য সে-রকম ছিল না।

জন লো ছুটি থেকে ফিরে এসে জয়পুরে রেসিডেণ্ট হয়ে বদলি হয়ে গেলেন। পরে আরও দুজন কমিশনার আসেন। তারও পরে জেম্‌স ম্যানসন বিঠুরের কাজের ভার নেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিঠুরের কমিশনার ছিলেন। ম্যানসনের মনে হয়েছিল, বাজীরাওয়ের দিন ফুরিয়ে এসেছে। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পরে তাঁর দত্তকপুত্র বৃত্তির জন্য আবেদন করেন, কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়। ভাবখানা এই যে, অনেক দেওয়া হয়েছে, আর নয়। তবে বিঠুরের জায়গিরে নানাসাহেবকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর প্রাসাদের শুধু ধ্বংসাবশেষই এখন আছে। সিপাহি- যুদ্ধের সময় বিঠুরে ইংরেজ সৈন্যর সঙ্গে নানাসাহেবের যুদ্ধ হয়েছিল। ইংরেজ সৈন্যরা কামানের গোলায় বাজীরাওয়ের প্রাসাদ চূর্ণ করে দেয়।

কুড়ি-একুশ বছর আগে বিঠুরে গিয়ে দেখেছি, অনেকটা জায়গায় ভাঙা ইঁটের স্তূপ। সেখানে কিছু-কিছু জায়গায় চাষ হচ্ছে, বাকিটা জঙ্গল। এইরকম জায়গা সাপের খুব প্রিয়। সাপের জন্য গ্রামের লোক সেখানে ঢুকতে সাহস পায় না। একটু দূরে রামচন্দ্র পন্তের বাড়ি। গ্রামের লোকেরা বলেছিল, বাড়িটা ভুতুড়ে। আমি দেখলুম, বাড়ি তখন মেরামত হচ্ছে। সেখানে স্কুল বসবে। নদীর ধারে একসারি শিবমন্দির। দেখলে বাংলাদেশের মন্দির বলে মনে হয়। বাজীরাও কোথা থেকে লোক নিয়ে গিয়ে মন্দির বানিয়েছিলেন, জানি না। সব মন্দির পরিত্যক্ত। পূজা হয় না কোথাও, আলো জ্বলে না। গ্রাম থেকে দু'একজন লোক আমার সঙ্গে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, একটি মন্দিরেই শুধু পূজা হত। মন্দিরের পুরোহিত একটি সাপ পুষেছিল। তাকে দুধ খাওয়াত। একদিন সন্ধ্যায় সে দুধ খাওয়াতে এসে সাপকে দেখতে পায়নি, ভুল করে সাপের গায়ে পা লেগে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ সাপ তাকে কামড়ে দিল। বাঁচানো গেল না।

এই বলে লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সাহেব, তুমি কিন্তু কখনও সাপ পুষো না। যতই পোষ মানুক না কেন, একদিন না একদিন সে তোমাকে কাটবেই।"

ছবি : অনুপ রায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

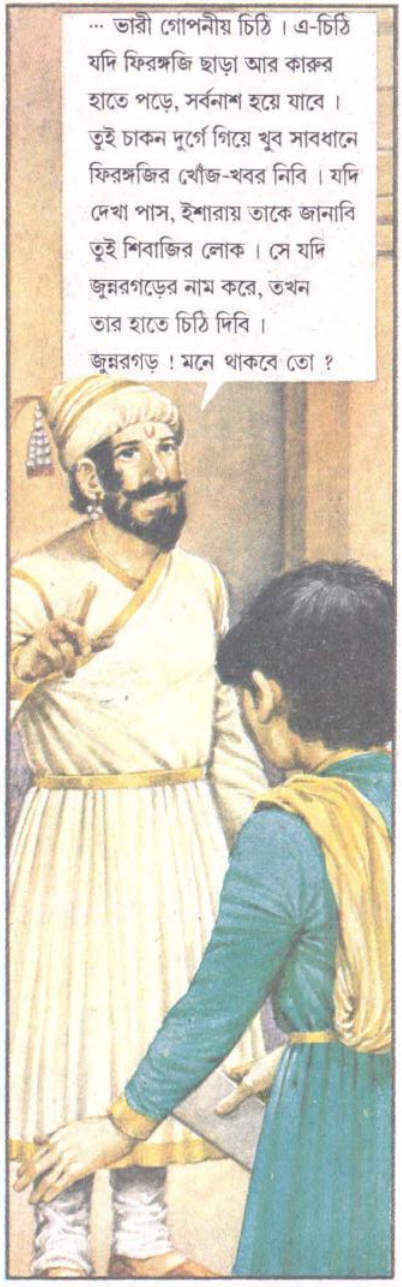

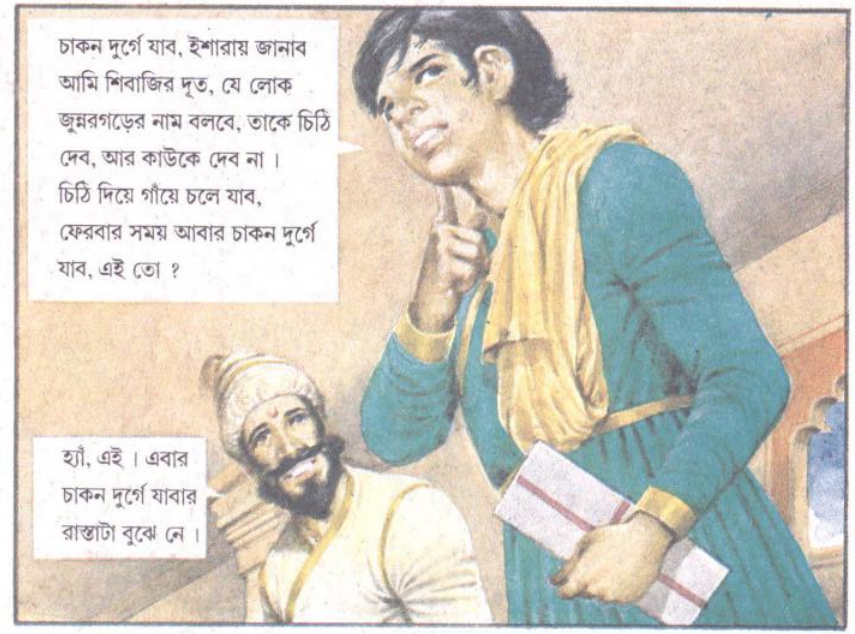

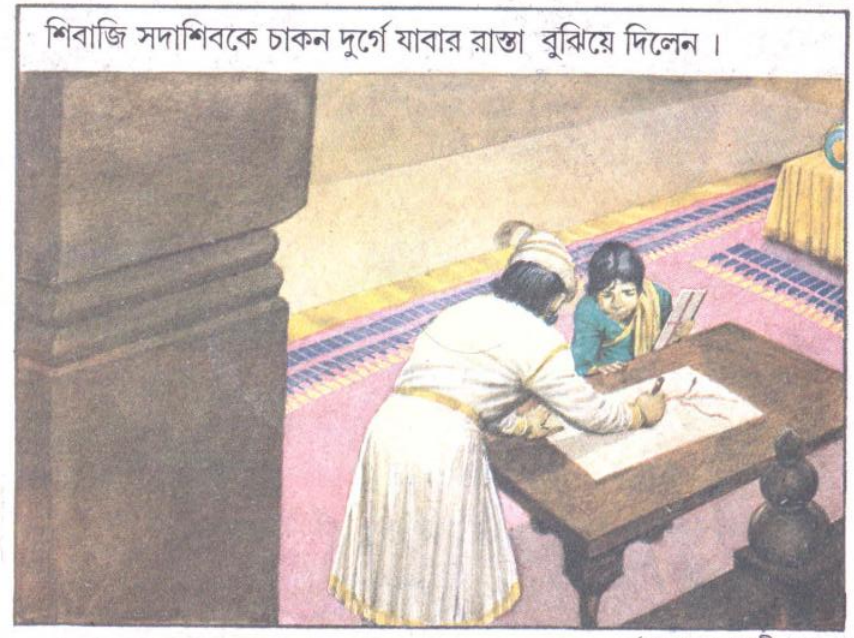

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আলাপ

নাম কী রে ?
—চৈতালি ।
বাড়ি কোথা ?
—কৈখালি ।
দিদির নাম ?
—বৈশালি ।
খাবি কী ?
—খৈ খালি ।
তাড়াতাড়ি পাত খালি ।
দাও জোরে হাততালি !

সহেলি মুখোপাধ্যায় (বয়স ৮)

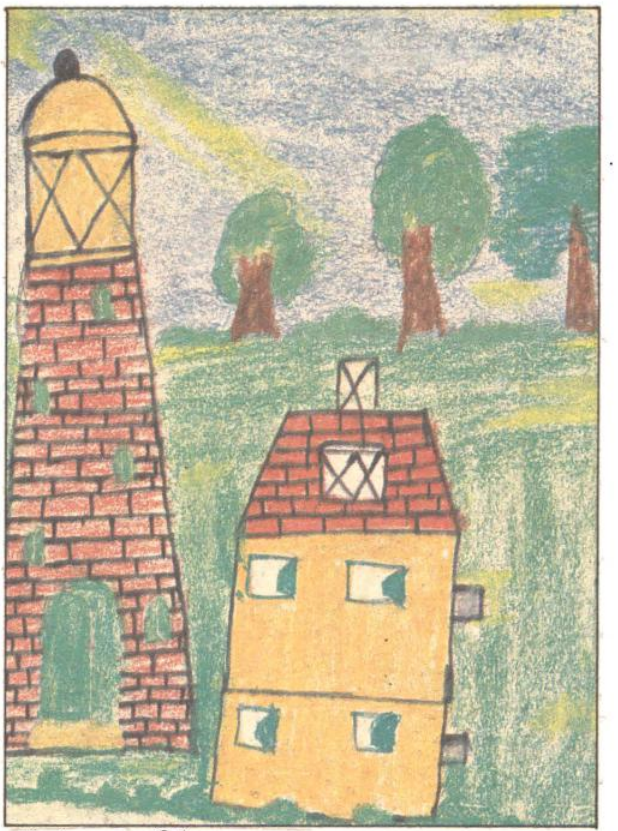

ছবি এঁকেছে **অর্পিতা সান্যাল** (বয়স ৮)

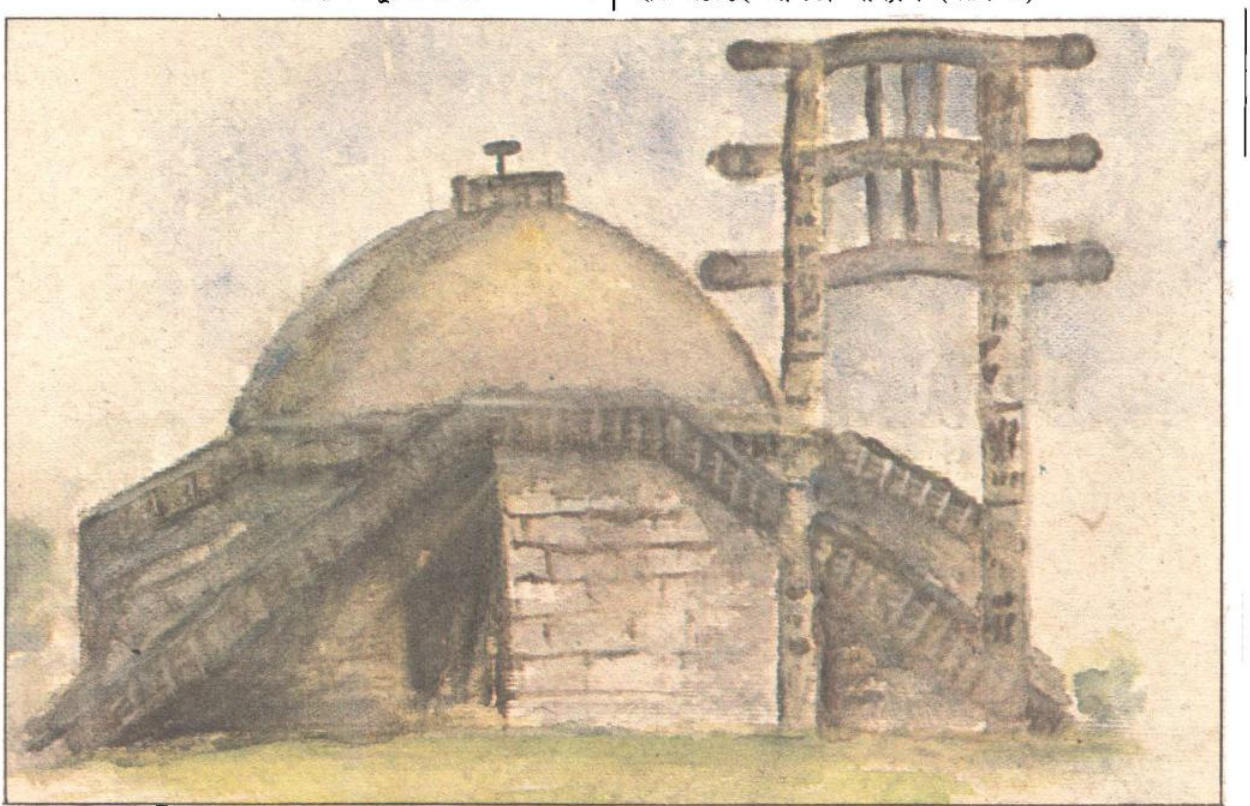

ছবি এঁকেছে **অমিতাভ দত্ত** (বয়স ১১)

দুষ্টু টিয়ার শাস্তি

আমার একটা টিয়াপাখি ছিল। আমি তাকে আমার নাম 'পিউ' বলতে শেখাতাম, কিন্তু সে শুধু বলত ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ। দুষ্টুটা মাঝেমাঝে খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসত। আমি তখন তাকে আবার খাঁচায় ভরে খুব বকতাম।

একদিন সে খাঁচা খুলে উড়ে পাশের বাড়ির বাদলদের গাছে গিয়ে বসল। একটু বাদে বাদল তাকে ধরে নিয়ে গেল। আমি গিয়ে পাখিটা চাইলাম। বাদল বলল, "এটা যে তোমার পাখি তার প্রমাণ কী?"

আমি বললাম, "পাখিটার ঠোঁট লাল।"

সে বলল, "সে তো সব টিয়ারই থাকে।"

আমি বললাম, "ওর সুন্দর লম্বা লেজ আছে।"

বাদল এবার বিশ্রীভাবে হেসে বলল, "লম্বা লেজ তো সব টিয়ারই থাকে।" তারপর একটু ভেবে বলল, "আচ্ছা দাঁড়া, তোর টিয়া দিচ্ছি।"

একটু পরে ভেতর থেকে ফিরল। একহাতে টিয়া, অন্য হাতে তার কাটা লেজ! দেখে আমার খুব দুঃখ হল। ও বলল, "তোর টিয়ার চিহ্ন রেখে দিলাম।"

ক্রেসিডা মুখোপাধ্যায় (বয়স ৯)

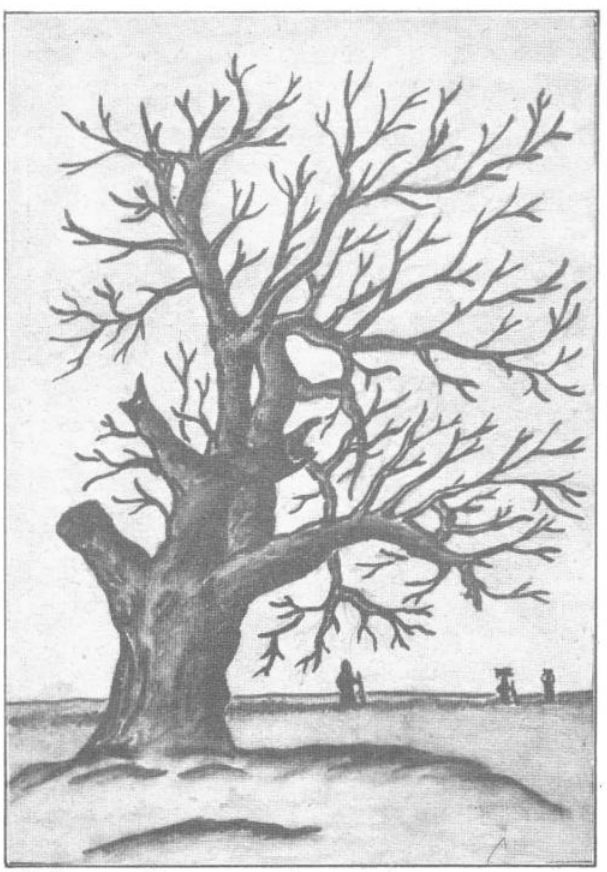

ছবি এঁকেছে **সৌম্যব্রত বসু** (বয়স ১৪)

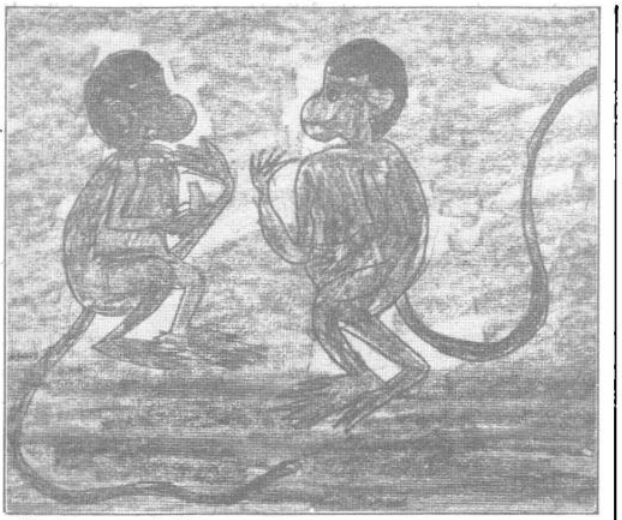

ছবি এঁকেছে **কৌশিক সেনগুপ্ত** (বয়স ৮)

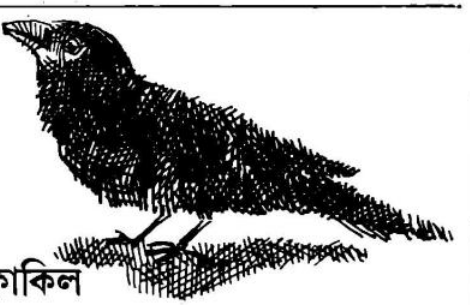

আমার কোকিল

বড় রাস্তার ধারে আমাদের বাড়ি। গায়ে গায়ে আরও বাড়ি। সকালে দোতলার বারান্দায় এলে রবির আলো পাওয়া যায় না। পুবের দিকের বড় বাড়িগুলো বিরাট বাধা।

বারান্দায় বসে বসে দেখা শুধু গাড়ির চলাচল। জনজীবনের চলা। রোজ-রোজ। প্রতিদিন। একঘেয়ে লাগে।

একঘেয়েমি কাটাতেই যেন এল এক কোকিল। আমরা পাখিওয়ালার কাছ থেকে একটা কোকিল কিনে আনলাম। খাঁচা আনলাম। দানা আনলাম। কোকিল থাকবে, খাবে। কোকিলের খাঁচা দোতলার বারান্দায় রাখলাম।

প্রতিদিনের সব কাজের ফাঁকে আসি বারান্দায়। শহরের জীবন দেখি। দেখি কোকিলকে। আগের চেয়ে ভাল লাগে।

আমাদের পোষা কোকিল ডাকে। শুধুই ডাকে। ডাকের আর শেষ নেই। সেই ভোরের আগে থেকে মিঠে সুরে ডাকা শুরু হয়। আবার রাতে যখন শুতে যাই তখনও তার ডাক শুনি।

এখন আর রাস্তার ধারের বারান্দায় এসে দাঁড়ালে একঘেয়ে লাগে না। পরিবেশ ভাল হলে মন ভাল থাকে। মনে ভাল ভাব আসে। ভাবছি এবার কোকিলকে ছেড়ে দেব। তার বোধহয় একঘেয়ে লাগছে।

কোকিলা গুপ্ত (বয়স ১৪)

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

'৫৮-৫৯ সালে গিলক্রিস্ট ভারত সফরে এসেছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের হয়ে। সে-কথা তোমরা সবাই জানো। এবং সেবারই কড়া অধিনায়ক গেরি আলেকজাণ্ডার তাঁকে কীভাবে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন, সে-কাহিনীও তোমাদের অজানা নয়। বিভিন্ন কাগজপত্রে ফলাও করে বারবার সেই ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়েছে।

এই দলে ছিলেন সার গারফিল্ড স্ট্যানলি অবার্ন সোবার্স। ভারতবর্ষের মাটিতে ওটাই ছিল ক্রিকেটের বৃহত্তম প্রতিভার প্রথম আত্মপ্রকাশ। অবশ্য আমি সোবার্সকে দেখেছিলাম অনেক আগে। তাঁর নিজের দেশে। চিনিয়ে দিয়েছিলেন সার ফ্রাঙ্ক ওরেল। একদিন মাঠে বসে দিব্যি ফ্রাঙ্কির সঙ্গে খোশগল্প হচ্ছে। উইকেটে যে একটা বাচ্চা ছেলে খেলছে, সে-দিকে আমাদের বিশেষ খেয়াল নেই। ক্রিকেটের নানা আলোচনায় বেশ জমে উঠেছে আসর। কার সঙ্গে খেলা হচ্ছিল মনে নেই।

"যে ছেলেটা এখন ব্যাট করছে,তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?" ফ্রাঙ্কি হঠাৎই প্রশ্ন করে বসলেন। আমি আলাপ হয়েছে কি হয়নি তা স্পষ্টভাবে মনে করে উঠতে পারছিলাম না। আসলে দিনের মধ্যে যে কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, তার তো ঠিক নেই। তাদের সবাইকে মনে রাখা অসম্ভব। এমন লোকজনকেই মনে থাকে, যার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল। অথবা কোনো বিশেষ ঘটনা তাকে মনে রাখতে বাধ্য করে। আমি চেষ্টা না করলেও আপনাআপনি তাদের কথা মনে থাকে। সেই ঘটনার কথা উঠলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির ছবি ভেসে ওঠে।

প্যাংলা চেহারার ছেলে। ধারালো মুখ। খুব উজ্জ্বল চোখ। কিন্তু মনে করতে পারছিলাম না কোথায় আলাপ হয়েছে।

"হয়েছে বোধহয়।" নিচুস্বরে ফ্রাঙ্কির প্রশ্নের জবাব দিলাম।

সোজাসুজি উইকেটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ওরেল। বললেন, "বড় ভালঁ ছেলে। রক্তে ক্রিকেট নিয়ে জন্মেছে। চমৎকার ব্যাট করে। ওর ব্যাট করার কায়দা আমাকে রীতিমত মুগ্ধ করেছে। আমার ধারণা, এই ছেলেটিই একদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেরা খেলোয়াড় হয়ে উঠবে।"

ওরেলের সার্টিফিকেট মানে চাট্টিখানি ব্যাপার নয়! নজর ফেলে রাখলাম ছেলেটার ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম, চোখদুটো ভীষণ ভাল আর টাইমিং সম্পর্কে তার চমৎকার ধারণা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ফুটওয়ার্ক। বারবাডোজের দু'জন খেলোয়াড় কাছাকাছি বসে ছিল। আধভাঙা ইংরেজিতে একজন বলল, শুধু ব্যাট করাই নয়, বল করতেও দক্ষ। ফিল্ডিংয়েও বেশ হাত পাকিয়েছে। নিজের টিমমেট বলে সে একটুও বাড়িয়ে বলছে না। বারবাডোজে যে-কোনো লোককে এই প্যাংলা ছেলেটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে, সে বাড়িয়ে বলছে কি না।

যে-কোনো লোককে! বিলক্ষণ অবাক হওয়ার বিষয়। অর্থাৎ এরই মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ছোকরা। পেছন থেকে একটা মন্তব্য এই সময় ভেসে এল, "সোবার্স হচ্ছে ব্যাটিংয়ে থ্রি ডব্লুর উৎকৃষ্ট সংমিশ্রণ।" মন্তব্যটা কে করল মাথা ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। বোঝা গেল না। ওরেল উঠে চলে গেলেন। নিরভিমান, নিরহঙ্কার মানুষ। প্রশংসাকে প্রশ্রয় দেন না। আমি ভাবতে লাগলাম, অসম্ভব। ওরেল, উইকস, ওয়ালকটের মিশেল হিসেবে এই শীর্ণকায় ছেলেটিকে আমি ভাবতে পারছিলাম না। এই তিনজন ব্যাটসম্যানের কথা আগে লিখেছি। কেমন জাতের ব্যাটসম্যান তাঁরা, তা আমি দেখেছি একেবারে কাছ থেকে। তিনটি বিশাল প্রতিভার যথার্থ পরিচয় পেয়েছিলাম বলেই মন্তব্যটাকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারছিলাম না। যদিও ওই বয়সে সোবার্সের মধ্যে ফুটে উঠেছিল জাত-ব্যাটসম্যানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। তা বলে একেবারে ওই পর্যায়ে! সত্যি বলছি, আমি খানিকটা অবিশ্বাসই করেছিলাম।

কিন্তু ওরেল অনেক বড় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। রাত্রে হোটেলে দেখা হয়েছিল। এক ফাঁকে বললেন, "যদি ঠিকমতো বিকশিত হতে পারে এই ছেলেটি, নিশ্চিত জেনো, ক্রিকেট-বাগানের এক আশ্চর্য ফুল হয়ে উঠবে।"

ওরেল বেঁচে থাকতেই, এই চমৎকার ফুলটি গন্ধে আমোদিত করেছে সারা পৃথিবী। আজ নয়, '৫৮-৫৯ সালেই আমি টের পেয়েছিলাম যে, এক সাংঘাতিক প্রতিভা

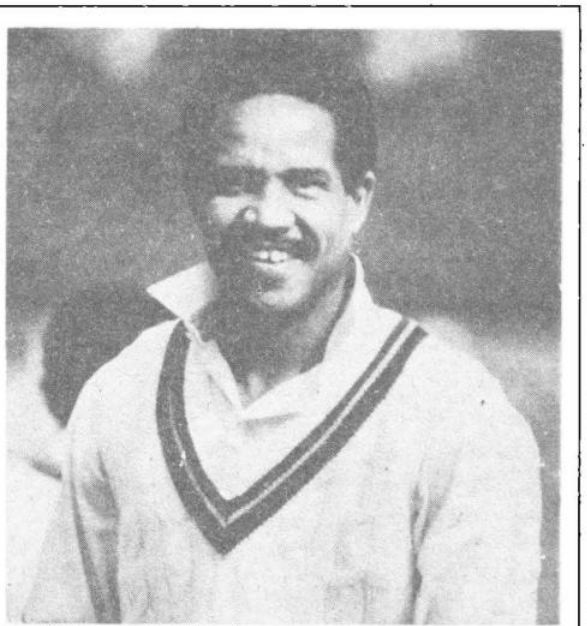

গারফিল্ড সোবার্স : 'ক্রিকেট-বাগানের আশ্চর্য ফুল'

ক্রিকেট-জগতে এসে পড়েছে অনেক কিছু ওলটপালট করে দিতে। কানপুরে তার ১৯৮ রানের ইনিংস চিরকাল মনে থাকবে। ঠিক সে-ভাবেই মনে থাকবে, যে-ভাবে মনে থাকবে ইডেনে গ্রেট ব্যাটসম্যান রোহন বাবুলাল কানহাইয়ের ২৫৬ রানের ইনিংসটির কথা।

আরও উদাহরণ আছে। অসংখ্য। ১৯৭১ সালের বিখ্যাত ডাবল সেঞ্চুরিটির কথা কি ভোলবার? অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের সঙ্গে খেলা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার, মেলবোর্নে। অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের অধিনায়ক ছিলেন গ্যারি সোবার্স। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত পেস বোলার ডেনিস লিলি প্রথম ইনিংসে ১৮৪ রানে বিপক্ষের সবাইকে আউট করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ধস নামার মুখে ক্রুদ্ধ অধিনায়ক সোবার্স ২৫৪ রানের যে ইনিংস খেলেছিলেন, তা ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে। খেলা দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন ক্রিকেটের আরেক আশ্চর্য প্রতিভা, সার ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যান। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ব্রাডম্যান বললেন, "আমার বিশ্বাস, গ্যারি সোবার্সের এই ইনিংসটিই, অস্ট্রেলিয়ায় আমার দেখা সর্বোৎকৃষ্ট খেলা। যে-সমস্ত দর্শক সোবার্সের এই খেলা দেখেছেন তাঁরা ক্রিকেটের এক ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এটা তাঁদের মস্ত বড় সৌভাগ্য।"

ব্রাডম্যানের কাছ থেকে এমন প্রশংসাবাক্য পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। কারণ, সকলেই জানে, ব্রাডম্যান সহজে উচ্ছ্বসিত হন না। আর হলেও বোঝা শক্ত। ভাব চেপে রাখার ব্যাপারে তিনি বেশ দক্ষ। অন্যের প্রশংসা করতে গিয়ে টিপে টিপে শব্দ খরচ করেন ব্রাডম্যান।

অনেকদিন আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের 'সিংহপুরুষ' লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন একটি অল্পবয়সী ক্রিকেটারের দিকে আঙুল তুলে ব্রাডম্যানকে বলেছিলেন, "দেখো ডন, এই ছেলেটি একদিন ক্রিকেট-বিশ্বের গর্বের বস্তু হয়ে উঠবে। আমি বলছি, হবেই। তুমি মিলিয়ে নিও।" অস্ট্রেলিয়ার এক নামকরা মাসিক ক্রিকেট পত্রিকায় পরে ব্রাডম্যান লিখেছেন, "জহুরির মতন নির্ভুল রত্নবিচার করেছিলেন কনস্ট্যানটাইন। একটি অল্পবয়সী ছেলের মধ্যে তিনি ঠিক চিনে নিয়েছিলেন ভবিষ্যতের মস্ত সম্ভাবনাকে। যা কেবল একজন প্রচণ্ড দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই বলা সম্ভব, নিঃসন্দেহে।"

সোবার্স সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার। ক্রিকেটের সর্বোত্তম সম্পদ। কেন জানো? ক্রিকেটের সব বিষয়ে তাঁর সহজাত দক্ষতা। ব্যাট, বল, ফিল্ডিং—প্রতিটি জায়গায়। বল করায় তিনি শুধু একজন জোর-বোলার নন, প্রয়োজনে স্পিনও করাতে পারেন। আর সেটা এলেবেলে ধরনের গোঁজামিল গোছের স্পিন বোলিং নয়। রীতিমত প্রতিভার ছাপ আছে তাতে। স্পিনের ফাঁদে ফেলে বহু উইকেট শিকার করেছেন সোবার্স। দারুণ কথা বলেছেন ইংল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত অল-রাউণ্ডার ট্রেভর বেইলি। "সোবার্সকে বাদ দিয়ে, সামান্য বিবেচনাসম্পন্ন লোকের পক্ষেও, সর্বকালের সেরা বিশ্ব একাদশ গড়া সম্ভব নয়। কোন্ ক্ষেত্রে বাদ দেবেন সোবার্সকে! ব্যাটিং? অসম্ভব! বোলিং? সাফল্য চমকপ্রদ। ফিল্ডিং? অতুলনীয়। এর যে-কোনো একটা বিষয়ে ভাবুন, সোবার্সকে অপরিহার্য মনে হবেই। ফলে কাঁচি চালাবার আর কোন্ রাস্তাটা খোলা রইল?" (ক্রমশ)

রাত তিনটেয় টিভির সামনে

জীবন ভৌমিক

লস্ এঞ্জেলেস ওলিমপিক্সে ভারতের হকি খেলা রাত তিনটেয় টিভিতে সরাসরি দেখানো হবে শুনে সুজয়ের সঙ্গে তার দাদুও সকাল থেকে নাচছিলেন। কিন্তু সুজয়ের মায়ের মূর্তি দেখে দুজনেই হতভম্ব।

সুজয় ক্লাস নাইনে পড়ছে। রাত তিনটেয় সে অবশ্য কোনোদিন ওঠেনি। তবে ভোর পাঁচটায় ওর দাদু যখন মর্নিং-ওয়াক করতে বার হন, তখন সুজয়কে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে যান। তুলে দিলে হবে কী! দাদু বেরিয়ে গেলে ঘুম ল্যাপটানো চোখে সুজয় আরেক রাউণ্ড ঘুমিয়ে নেয়। মর্নিং-ওয়াক সেরে বোতলের দুধ নিয়ে দাদু যখন ফিরে আসেন কিংবা সুজয়ের মা-বাবা যখন সাড়ে ছটা নাগাদ ঘুম থেকে ওঠেন, তার আগেই কিন্তু সুজয় পড়ার টেবিলে বসে যায়। ভাবখানা তার এই, যেন সে ভোর পাঁচটা থেকেই লেখাপড়া করছে।

সুজয়ের এই ফাঁকি যেদিন তার মা ধরে ফেলেন, সেদিনই ভোর তিনটেয় উঠে হকি খেলা দেখার আনন্দে নাতির সঙ্গে দাদুও লাফাচ্ছিলেন। তাই দেখে সুজয়ের বাবা মুখ টিপে হাসলেও মা কিন্তু ছাড়েননি। মা বলেছিলেন, "দরকার হলে টিভি আমাদের ঘরে নিয়ে আসব। তবু রাত তিনটেয় আমি টিভি দেখতে দেব না।"

আসলে সুজয়ের সেদিন শরীর খারাপ ছিল। আগের দিন রাত্রে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধও দেওয়া হয়েছে। রাত তিনটে থেকে জেগে বসে থাকলে অসুখ আরও বেড়ে যাবে। বাবার আপত্তি ছিল এইখানে। এর ওপর মায়ের আপত্তি। যে ছেলে ভোর পাঁচটায় ওঠে না, খেলা দেখার জন্য সে তিনটেয় উঠবে কেন? চলবে না এসব।

সুজয়ের কারণে এমন একটা খেলা দেখা বানচাল হতে চলেছে দেখে দাদুর মন খারাপ। সুজয়ের বাবার কিন্তু এসব ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ নেই। ভীষণ ঘুমকাতুরে লোক সুজয়ের বাবা। তাছাড়া খেলাটেলা দেখার তেমন ঝোঁকও নেই তাঁর।

রাতে খাবার টেবিলে বসে দাদু সুজয়ের মাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ বৌমা, রাত তিনটেয় উঠে খেলা দেখার কোনো যুক্তি নেই। সবসময় এত হুজুগে মাতলে চলে না।"

দাদুর কথা শুনে সুজয় তাঁর দিকে জুলজুল করে তাকায় আর মনে মনে বলে, 'দাদু তুমিও!' গোঁফের আড়ালে দাদুর কপট হাসির ঝিলিক সুজয়ের নজরে পড়ে না।

ন্যাশনাল কারিগরী আন্তর্জাতিক গুণমান নিপ্পো ব্যাটারি

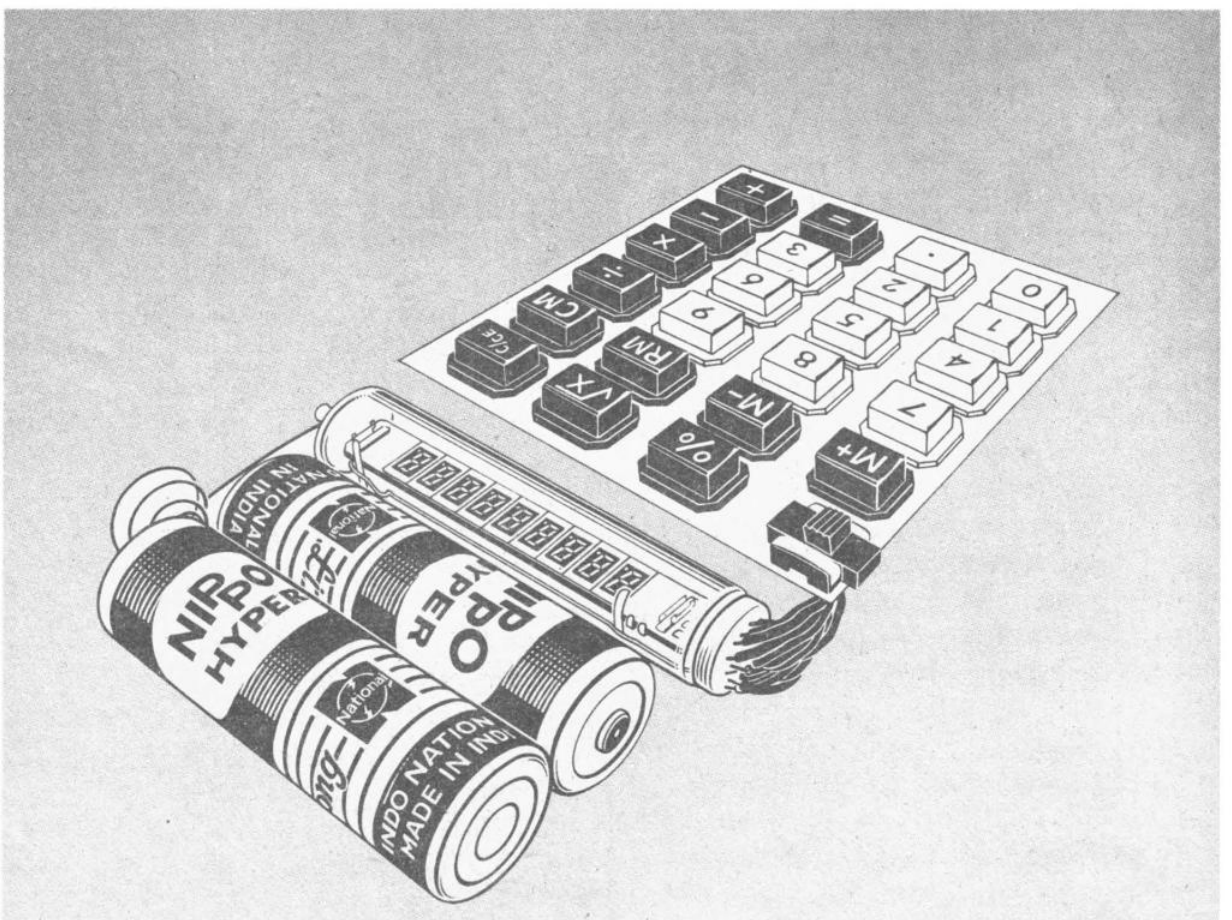

খাস জাপানের নামজাদা "ন্যাশনাল" মানেই বিশ্বের পয়লা নম্বর কারিগরী. তারাই বানায় নিপ্পো ব্যাটারি । আপনার কেনবার পক্ষে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ড্রাই সেল হল এগুলিই-- আপনি নিশ্চয় আপনার নামী দামী সরঞ্জামগুলিতে যে কোন অন্য ব্যাটারি ব্যবহার করতে ভরসাই পাবেন না ?

- উপরে সীলবন্ধ থাকাই গ্যারাণ্টি দেয় এ ফ্যাক্টরি থেকে সদ্য বেরনো টাট্‌কা শক্তি
- আই এস আই মার্কা আপনাকে দেয় সেরা গুণমানের প্রতিশ্রুতি
- ধাতু দিয়ে মোড়া বলে লীক করার ভয় থেকে পুরোপুরি সুরক্ষা
- প্রত্যেকটি ব্যাটারি আপনার হাতে পৌঁছয় খুঁটিয়ে পরীক্ষার পর

নির্ভরযোগ্য শক্তির সম্পূর্ণ সম্ভার

- নিপ্পো হাই-টপ • নিপ্পো সুপার
- নিপ্পো হাইপার • নিপ্পো স্পেশাল
- নিপ্পো পেনলাইট

National **নিপ্পো** ব্যাটারি

টেকনিক যার খাস জাপানের ন্যাশনাল হতে আর এর শক্তিশালী ব্যাটারি তৈরি হয় ভারতে

everest/84/INL/140-bn.

ডাইনিং স্পেসের লাগোয়া সুজয়দের পাশাপাশি দুখানা বেডরুম। পশ্চিম দিকেরটা সুজয়ের মা-বাবার। আর পুব দিকেরটা সুজয় ও তার দাদুর ঘর। টিভি রয়েছে সুজয়দের ঘরে। কিন্তু মায়ের অনুমতি ছাড়া টিভি খোলা চলে না। যাই হোক, সেদিন রাত সাড়ে দশটায় যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

সুজয় দাদুকে বলল, "দাদু, তা হলে খেলা দেখা হবে না ?"

"কে বললে হবে না ! আলবত হবে।" দাদু বলেন।

সুজয় বলে, "কিন্তু রাত তিনটেয় অ্যালার্ম দিলে মায়ের কানে যাবে।"

"তার ব্যবস্থা করছি," বলে দাদু অ্যালার্মের কাঁটা তিনটেয় রেখে বার কয়েক তার চাবি ঘুরিয়ে দিলেন। তারপর ঘড়িটা তাঁর মাথার বালিশের কাছে তোশকের তলায় চাপা দিয়ে রেখে বললেন, "অ্যালার্ম এবার আর ক্রিং ক্রিং করে বাজবে না। বাজবে কুড়কুড় করে। আমি ছাড়া, এমন-কী তুইও শুনতে পাবি না। নে, শুয়ে পড়। আমি তোকে ডেকে দেব।"

সুজয় বলল, "দি আইডিয়া ! দাদু, আমরা তাহলে তো সাউণ্ডলেস টিভি দেখতে পারি। খেলাটা দেখা নিয়ে কথা। আমরা টিভিতে যদি সাউণ্ড না দিই তবে তো মা টের পাবেন না।"

দাদু বললেন, "তা-ই তো করব রে।"

তো দাদু তা-ই করেছিলেন। রাত তিনটেয় উঠে দাদুর সঙ্গে সুজয়ও নিঃশব্দে টিভির সামনে বসল। টিভিতে শব্দ নেই, কিন্তু খেলা চলছে। পাশের ঘরে মা-বাবা ঘুমুচ্ছেন।

ওদের ঘরের পুব দিকের দেওয়ালের সামনে টিভি। তার পাশে জানলা। জানলাটা খোলা। বাইরে সুজয়দের ছোট্ট ফুলবাগান। বাগানে তখন শেষ রাতের ফিকে জ্যোৎস্নার আলো। আলো কেটে শনশন বাতাস। ভারত তখন এক গোলে হারছে। খেলায় দারুণ উত্তেজনা। হঠাৎ সুজয়ের চোখ টিভির পর্দা থেকে সরে গিয়ে ডান দিকে খোলা জানলায় পড়ল। এবং জানলায় যেন কার মুখ দেখতে পেল সুজয়। চমকে উঠল। প্রথমবার সে দাদুকে কিছু বলল না। হয়তো তার চোখের ঘুম কাটেনি। কী দেখতে কী দেখেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার সেই মুখ। দাদু কি দেখতে পাচ্ছেন না?

"দাদু !" খুব আস্তে ডাকল সুজয়।

"কী হল রে !" ফিসফিস করে দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

সুজয় দাদুর কানে কানে বলল, সে বারবার খোলা জানলার বাইরে একটা মুখ দেখতে পাচ্ছে। মুখটা বিশুদাদুর।

বিশুবাবু সুজয়ের দাদুর বন্ধু। তাঁর মর্নিং-ওয়াকের সঙ্গী। পাশের বাড়িতেই থাকেন। বিশুবাবুর ছেলে আর ছেলের বৌ জয়পুর বেড়াতে গেছে। বিশুবাবু যাননি। বাড়িতে মধু নামে বৃদ্ধ গৃহভৃত্যটি রয়েছে। বিশুবাবু খুব ভাল লোক। সুজয়কে নিজের নাতির মতো ভালবাসেন। সুজয়ের মা বিশুবাবুকে নিজের বাবার মতো শ্রদ্ধা করেন।

কিন্তু রাত তিনটের সময় টিভির পাশে খোলা জানলায় বারবার বিশুদাদুর মুখ ভেসে উঠছে কেন ! সেই কথাটাই সুজয় তার দাদুকে কানে কানে জিজ্ঞেস করল। দাদু একবার জানলায় উঁকি মেরে দেখলেন। নাঃ, কেউ নেই।

দাদু বললেন, "তুই ঠিক দেখেছিস ?"

সুজয় বলল, "আমি পষ্ট দেখলুম বিশুদাদুকে। কিন্তু মুখটা মিলিয়ে গেল। দাদু, আমার ভয় করছে।"

শেষ কথাটা সুজয় একটু জোরেই বলে ফেলেছিল। পাশের ঘর থেকে তার মা-বাবা শুনতে পেয়ে গেলে কেলেঙ্কারি ব্যাপার। হাত দিয়ে সুজয়ের মুখ চেপে দাদু আস্তে আস্তে বললেন, "অনেক সময় এমন হয়। যদিও অলৌকিক ব্যাপার, তবুও হয়। মনে হচ্ছে বিশুবাবুর কোনো বিপদ-আপদ হয়েছে।"

বিপদ সুজয়দেরও। কারণ তারা মা-বাবাকে ফাঁকি দিয়ে টিভিতে খেলা দেখছিল। তাঁদের জাগাতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। দরকার নেই ওঁদের জাগাবার।

হাতে টর্চ নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ির সদর-দরজা খুলে বাইরে থেকে পাল্লা দুটো আস্তে টেনে দিয়ে দাদুর সঙ্গে সুজয় গিয়ে বিশুবাবুর বাড়ির কাছে দাঁড়ায়। রাত তখন সাড়ে তিনটে।

বিশুবাবুর ভৃত্য মধুকে না ডেকে দাদু প্রথমে বিশুবাবু একতলায় যে ঘরে শোন, তার জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জানলাটা খোলা। ঘর অন্ধকার। টর্চ ফেলে দাদু চমকে ওঠেন। "সর্বনাশ !"

সুজয় দেখল, ঘরের মেঝেতে বিশুদাদু উপুড় হয়ে পড়ে আছেন।

তক্ষুনি সে দৌড়ে এসে তার মা-বাবাকে ডেকে তুলল। দাদু ততক্ষণে মধুকে ডেকে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছেন।

সুজয়ের মা হতচকিত হয়ে বললেন, "তোরা জানলি কী করে ?"

সুজয় বলল, "সে-সব কথা পরে হবে।"

বিশুবাবুর জ্ঞান ছিল না।

সুজয়দের পাড়াতে একটা ট্যাক্সি আছে। সুজয়ের বাবা ছুটে গিয়ে সেই ট্যাক্সি নিয়ে এলেন। তারপর বিশুদাদুকে নিয়ে হাসপাতালে। সঙ্গে সুজয় ও তার দাদু।

হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে সঙ্গে-সঙ্গে একটা ইনজেকশন দেওয়া হল। ডাক্তারবাবু বললেন, "স্ট্রোক হয়েছে। সিরিয়াস কেস। আর একটু দেরি হলে কোনও আশা থাকত না।"

আঠারো ঘণ্টা পর বিশুবাবুর জ্ঞান ফিরেছিল। তিনি বলেছিলেন, "রাত সওয়া তিনটে নাগাদ বাথরুম যাব বলে খাট থেকে নামতেই মাথা ঘুরে গেল। কেন জানি না, মুহূর্তের জন্য সুজয়ের কথা মনে এসেছিল। তারপর কী হল কিছু জানি না।"

সুজয়ের দাদু সুজয়ের মাকে বলেছিলেন, "বৌমা, তোমার কথা শুনলে আমাদের টিভির সামনে বসা হত না, বিশুবাবুকেও বাঁচানো যেত না।" তারপর সুজয় তার অভিজ্ঞতার কথা বলল।

মা বললেন, "সত্যি অবিশ্বাস্য ব্যাপার ! গল্পে এরকম ঘটে। কিন্তু তোরা ভেতরে-ভেতরে এতখানি ! শব্দ না করে টিভি দেখা !"

সুজয়ের বাবা বললেন, "পাজি ছেলে, মাকে সত্যি কথা বললেই পারতে। রাত তিনটেয় গরম-গরম কফি করে দিতেন।"

দাদু বললেন, "তা বটে ! তা বটে !"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

লালচুল সমিতি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : মিঃ উইলসন লালচুল সমিতিতে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নকল করতে নিযুক্ত হয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবার পর মিঃ উইলসন হঠাৎ একদিন দেখলেন যে, সমিতি উঠে গেল। কী ব্যাপার খোঁজ করে তিনি জানতে পারলেন, ঐ সমিতির কথা কেউ জানে না, সব ব্যাপারটা একটা বিরাট ধাপ্পা। মিঃ উইলসন হোম্‌সের কাছে এসেছেন এই ধাপ্পা দেবার কারণটা জানতে। হোম্‌স তাঁর কথা শুনে তদন্ত করতে রাজি হয়েছেন···

॥ ৩ ॥

মিঃ উইলসন চলে যাবার পরে হোম্‌স আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "তারপর ওয়াটসন, ব্যাপার কী বুঝলে বলো ?" আমি খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করলুম যে, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। "এ তো দেখছি ভীষণ জটিল রহস্য।"

"কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় বলে," শার্লক হোম্‌স বললে, "আপাতদৃষ্টিতে যে সমস্যা যত রহস্যময় যত উদ্ভট বলে মনে হয় আসলে সেটা তত জটিল না-ও হতে পারে। বরঞ্চ খুব সাদামাটা খুব তুচ্ছ সমস্যাই অনুসন্ধান করতে গিয়ে জটিল হয়ে উঠতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে তুমি ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারবে। কোনো খুব সুন্দর বা খুব কুৎসিত মুখ মনে রাখা খুব সহজ। কিন্তু খুব সাদামাটা সম্পূর্ণ সাধারণ একদম বিশেষত্বহীন মুখ মনে রাখা বড় শক্ত। কিন্তু মিঃ উইলসনের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ফয়সালা করতে হবে।"

"কী করবে ভাবছ ?"

"এখন বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেব। অন্তত পক্ষে তিন পাইপ তামাক না পোড়ালে কিছু হবে না। দয়া করে ঘণ্টা-খানেক চুপচাপ বোসো। বাজে কথা বলে বিরক্তকোরো না।"

মোটা কালো পাইপটা ধরিয়ে হাঁটু দুটো গুটিয়ে আরাম-কেদারায় আধশোয়া হয়ে হোম্‌স চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে ধূমপান করতে লাগল। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমি ভাবলুম হোম্‌স বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যি কথা বলতে কী আমার নিজেরই ঢুলুনি আসছিল। হঠাৎ হোম্‌স তড়াক করে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর ম্যান্টেলপিসের ওপর পাইপটা রেখে আমাকে বললে, "আজ বিকেলে সেন্ট জেমস হলে খুব ভাল বাজনা আছে। শুনতে গেলে মন্দ হয় না, কী বলো ওয়াটসন ? সন্ধেবেলায় তোমার ক-জায়গায় রোগী দেখতে যেতে হবে ?"

আমি বললুম, "হোম্‌স, তুমি তো জানো যে আমার 'প্র্যাকটিস' সে-রকম কিছু সাংঘাতিক নয়। আর তাছাড়া আজ সন্ধেটা আমার ছুটি।"

"তা হলে এসো চটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে আমরা একটু এ-দিক ও-দিক ঘুরব। তারপর সুবিধেমতো কোথাও ডানহাতের কাজ সেরে নিয়ে বাজনা শুনতে যাব।...বুঝলে ওয়াটসন, ফরাসি কি ইতালীয় সঙ্গীতের চেয়ে জার্মান সঙ্গীত আমার বেশি ভাল লাগে। জার্মান সঙ্গীতের যে গম্ভীর ভাব তা মনকে শান্ত করে। ভাবায়। ওয়াটসন, আমি এখন ভাবতে চাই, বুঝলে, ভাবতে চাই।"

আমরা গাড়ি করে অল্ডারসগেট পর্যন্ত গেলুম। সেখান থেকে দুচার মিনিট হাঁটলেই স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার। আমাদের আজ সকালের মক্কেল মিঃ উইলসনের পাড়া। দেখলেই বোঝা যায় যে, স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার খুব পুরনো পাড়া। অত্যন্ত ঘিঞ্জি আর কেমন যেন অপরিষ্কার। সারিবন্দী বাড়িগুলোর সামনে লোহার রেলিং-ঘেরা ছোট একটা পার্ক। পার্কটা ঘাস আর আগাছায় ভরা। বাড়িগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে আমরা হাঁটছিলুম। কোণের বাড়িটার কাছে আসতে নজরে পড়ল দরজার ওপর সাদা হরফে লেখা : মিঃ জাবেজ উইলসন। বুঝলুম, এই আমাদের লালচুল মক্কেলের বাড়ি আর দোকান। উইলসনের বাড়ির সামনে এসে হোম্‌স একদৃষ্টিতে সেই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সে খুব ধীরে-ধীরে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত বারবার পায়চারি করতে লাগল। তার চোখ আশপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছিল। এইভাবে বেশ কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করবার পর সে আবার মিঃ উইলসনের বাড়ির কাছে ফিরে এল। তারপর উইলসনের বাড়ির সামনে দাঁড়াল আর ফুটপাথের ওপর তার হাতের লাঠিটা ঠক-ঠক করে বারকয়েক ঠুকল। ব্যাপার কী হচ্ছে আমি বোঝবার আগেই হোম্‌স গটগট করে গিয়ে মিঃ উইলসনের দরজায় ধাক্কা দিলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বেশ সুশ্রী একটি অল্পবয়সী ছেলে।

আমাদের দিকে তাকিয়ে সে হেসে বললে, "আসুন, আসুন।"

শার্লক হোম্‌স ধন্যবাদ জানিয়ে বললে, "এখান থেকে স্ট্র্যাণ্ডে যাবার রাস্তাটা যদি আমাদের বলে দেন—"

"এখান থেকে সোজা গিয়ে ডানদিকের তৃতীয় যে রাস্তা সেটা ধরে এগিয়ে যাবেন। তারপর বাঁদিকে চতুর্থ যে রাস্তাটা পড়বে সেটা ধরে সোজা যেতে হবে।" ছোকরা আর দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে ভেতরে ঢুকে গেল।

হাঁটতে-হাঁটতে হোম্‌স বললে, "অতি ধুরন্ধর ছোকরা। আমার হিসেবে এ ছোকরা লণ্ডনের যত ঘড়িয়াল লোক আছে তাদের তালিকায় চতুর্থ স্থান পাবার যোগ্য আর দুঃসাহসের দিক দিয়ে দেখলে এ বোধহয় তৃতীয় স্থান পাবে। এর কীর্তিকলাপ কিছু কিছু আমার কানে এসেছে।"

"বোঝা যাচ্ছে লালচুল সমিতির সঙ্গে মিঃ উইলসনের এই কর্মচারীটির বেশ ভাল রকম যোগাযোগ আছে। তুমি নিশ্চয়ই রাস্তা জানবার ছুতো করে ওকে দেখতে গিয়েছিলে।"

"না, ওকে দেখতে যাইনি।"

"তা হলে কী করতে গিয়েছিলে ?"

"ওর হাঁটুর কাছে ট্রাউজার্সের অবস্থাটা কী রকম সেটা দেখতে।"

"কী দেখলে ?"

"যা দেখব বলে ভেবেছিলুম।"

"তুমি ফুটপাথে ও-রকম ঠকঠক করে লাঠি ঠুকছিলে কেন ?"

"বন্ধু, এখন কথা না বলে সব কিছু ভাল করে দেখে নাও। এখন আমরা শত্রু-সীমানায় গুপ্তচরবৃত্তি করছি। সুতরাং সাবধান ! স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে। এবার চলো আশপাশের রাস্তা-টাস্তা-গুলো একটু ঘুরে আসি।"

স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে আমরা যে রাস্তায় এসে পড়লুম সেটা লণ্ডন শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবার একটা প্রধান রাস্তা। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে যে এই বড় রাস্তার ভিড়, এই অবিরাম গাড়িঘোড়ার হৈ-চৈ আর হট্টগোল থেকে কয়েক মিনিট গেলেই স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার যেন এক ঘুমন্ত পুরী। অথচ এখানে লোকের ভিড়ে ফুটপাথে হাঁটাই শক্ত। আর রাস্তায় যানবাহন চলাচলে এক মিনিটও বিরাম নেই।

বড় রাস্তায় এসে শার্লক হোম্‌স একটা কোণে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমাকে বললে, "জানো ওয়াটসন, লণ্ডনের প্রত্যেক পাড়ার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব খবর জানা আমার একটা বাতিক বলতে পারো। ঐ যে ঐদিকে দেখছ ওটা হল মার্টমারের সিগারেট-পাইপ-তামাকের দোকান, তার পরেরটা খবরের কাগজ আর পত্র-পত্রিকার স্টল, তারপর সিটি অ্যাণ্ড সাবার্বান ব্যাঙ্কের কোবুর্গ শাখা, তারপরে একটা নিরিমিষি খাবারের দোকান আর তারও পরে হল ম্যাকফার্লেনের গাড়ির কারখানা। ঐখানে গিয়ে এই সারিটা শেষ হয়ে গেল। চলো ওয়াটসন, এখনকার মতো আমাদের এখানকার কাজ শেষ। এইবার স্যাণ্ডুইচ সহ কফি পান করে সেণ্ট জেমস হলে গিয়ে বাজনা শোনা যাক। বেহালার কাছে কি কোনো বাজনা লাগে ? বেহালার ছড়ের টানে টানে যে সুরের জগৎ তৈরি হয় সেখানে কোনো উইলসন নেই, কোনো লালচুল সমিতি নেই। আছে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।"

হোম্‌স নিজে যে একজন ভাল বেহালা-বাজিয়ে তাই নয়, সে একজন প্রকৃত সঙ্গীতরসিক। সঙ্গীতপাগল বললেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। হলে ঢোকবার অল্পক্ষণের মধ্যেই সে একেবারে তন্ময় হয়ে গেল। মনে হল এখন বোধহয় বিশ্ব-সংসারের সব কিছুই সে ভুলে গেছে। হোম্‌সের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলুম। তাকে এই অবস্থায় দেখলে কে বলবে যে এই লোকটিই আবার অসামান্য বুদ্ধি আর কুশলতায় ইউরোপের কত চতুর কত জঘন্য অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে। আমি অনেক সময় দেখেছি যে, কোনো তদন্ত করবার সময় হোম্‌স যদি হঠাৎ এইরকম চুপচাপ হয়ে যায় তার মানেই হল যে সে অপরাধীকে ধরবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে। তাই এখন তার ঐ অবস্থা দেখে আমার মনে হল যে, কোনো লোকের সর্বনাশ হতে আর বেশি দেরি নেই।

"ডাক্তার, তুমি কি এখান থেকে সোজা বাড়ি যাবে ?"

"তাহলে আমার একটু সুবিধে হত।"

"ঠিক আছে। আমাকে এখন কয়েকটা অত্যন্ত জরুরি কাজ করতে হবে। তাতে অনেক সময় লাগবে। কোবুর্গ স্কোয়ারে তুমি বোধহয় বুঝতেই পেরেছ, ভীষণ সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটতে চলেছে।"

"কী-রকম সাংঘাতিক ?"

"খুব বড় ধরনের অপরাধ ঘটতে চলেছে। তবে মনে হচ্ছে যে, ঠিক সময়ে হাজির থেকে আমরা অপরাধীদের সব প্ল্যান বানচাল করে দিতে পারব। আজকে রাত্তিরে তোমার সাহায্য

আমার চাই।"

"কটার সময় আমাকে হাজির হতে হবে বলো?"

"ধরো দশটা নাগাদ।"

"যো হুকুম। আমি ঠিক দশটায় বেকার স্ট্রিটে গিয়ে হাজির হব।"

"ভাল কথা। শেষ পর্যন্ত হয়তো গোলমালও হতে পারে। তোমার মিলিটারি রিভলভারটা মনে করে নিয়ে এসো।"

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আমাকে হাত নেড়ে বিদায় দিয়ে হোম্‌স লোকের ভিড়ে মিশে গেল।

আমি জানি যে, আমি অসাধারণ বুদ্ধিমান নই ঠিকই, তবে নির্বোধও নই। আমি সাধারণ লোক। কিন্তু শার্লক হোম্‌সের সঙ্গে যখনই কোনো তদন্তে যাই তখনই আমার নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বোকা বলে মনে হয়। এই মিঃ উইলসনের ব্যাপারটাই ধরা যাক। হোম্‌স যা শুনেছে যা দেখেছে আমি-ও সে-সবই দেখেছি, শুনেছি। কিন্তু তার কথা থেকে মনে হল যে, সে শুধু সমস্ত ব্যাপারটা বুঝেই ফেলেনি, এর পরে কী ঘটতে চলেছে সেটাও আন্দাজ করে ফেলেছে। বাড়ি ফেরার পথে মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা নানা দিক থেকে পরীক্ষা করেও আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। কী উদ্দেশ্যে আজ আমাদের নৈশ অভিযান? কিসের আশঙ্কায় হোম্‌স আমাকে রিভলভার নিতে বললে? কোথায় আমাদের যেতে হবে? সেখানে আমরা কী করব, হোম্‌সের কথা থেকে শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে, মিঃ উইলসনের ঐ সহকর্মীটি একটি সাংঘাতিক লোক—বেশ গভীর জলের মাছ!

রাত্তির সওয়া-নটা নাগাদ আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্কের ভেতর দিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিট ধরে বেকার স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে লাগলুম। বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে দেখি দরজার কাছে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। বাড়ির মধ্যে পা দিতেই শুনতে পেলুম ভেতরে কারা যেন কথাবার্তা বলছে। ঘরে ঢুকে দেখলুম যে, হোম্‌স দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ খোশমেজাজে কথাবার্তা বলছে। ওঁদের একজনকে চিনতে পারলুম—পিটার জোন্‌স লণ্ডন পুলিশের একজন বড় কর্তা। অন্য ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারলুম না। আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হল না। তাঁর দিকে তাকাতে আমার দুটো জিনিস নজরে পড়ল। প্রথমত তার মুখের কাঁদো-কাঁদো ভাব আর দ্বিতীয়ত তার অত্যন্ত দামি পোশাক আর খুব চকচকে টুপি।

আমাকে দেখে হোম্‌স বলল, "যাক এবার আমরা তৈরি।" তারপর তার পুরু পশমের কোটের বোতাম লাগিয়ে নিয়ে সে দেওয়াল থেকে তার ভারী চাবুকটা পেড়ে নিল। "পিটার জোন্‌সকে তো তুমি চেনো ওয়াটসন। আর এঁর সঙ্গে তোমার বোধহয় পরিচয় নেই। ইনি মিঃ মেরিওয়েদার, আমাদের আজকের নৈশ অভিযানের সঙ্গী।"

জোন্‌সের স্বভাবই হল অন্য লোকের পিঠ চাপড়ে মুরুব্বিয়ানা করা। আমাকে দেখে সে একটু হেসে বললে, "ডাক্তার, তাহলে আমরা আরেকবার শিকার করতে যাচ্ছি। আমাদের বন্ধু একজন খুবই বড় শিকারি। কিন্তু মুশকিল হল যে, শিকারের পেছনে তিনি এই বুড়ো কুকুরটাকে দেন লেলিয়ে।"

মিঃ মেরিওয়েদার বেজার মুখে বললেন, "এত কাণ্ড করে শেষকালে যেন বুনো হাঁসের পেছনে মিথ্যে ছোটাছুটি করে খালি হাতে ঘরে ফিরতে না হয়।"

জোন্‌স বেশ গম্ভীরভাবে বললে, "আপনি মিঃ শার্লক হোম্‌সের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। যদিও মিঃ হোম্‌সের কাজের ধারা সম্পূর্ণ নিজস্ব, একটু বেশিমাত্রায় কল্পনানির্ভর, আর মিঃ হোম্‌স যদি রাগ না করেন তো বলি, মাঝে-মাঝে একটু কেমন যেন আজগুবিও বটে, তবুও এ-কথা বলব যে, একজন ভাল গোয়েন্দার যে-যে গুণ থাকা দরকার সে সবই তাঁর আছে। সত্যি কথা বলতে কী, দু-একবার যেমন শোলটো খুনের মামলায় কিংবা আগ্রার জহরত চুরির মামলায় আমাদের মানে সরকারি পুলিশের আগেই অপরাধীকে তিনি ধরে ফেলেছিলেন।"

"মিঃ জোন্‌স, আপনি যখন নিজের মুখে বলছেন তখন আমি সব কথাই মেনে নিচ্ছি। তবে কি জানেন, সাতাশ বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি আমার শনিবারের তাসের আড্ডায় হাজির হতে পারলুম না।"

মিঃ মেরিওয়েদারের কথার উত্তরে হোম্‌স বললে, "আজকের রাত্তিরে যে খেলা হবে সে-রকম রক্ত-জল-করা কোনো খেলা আপনি আগে কখনো খেলেননি। আর এ-খেলায় জিতলে আপনি তিরিশ হাজার পাউণ্ডের মতো ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবেন। আর জোন্‌স, তোমার কী লাভ হবে জানো? যাকে ধরবার জন্যে তুমি এত দিন চেষ্টা করে আসছ আজ তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করতে পারবে।"

"কাকে, জন ক্লে-কে?" উৎসাহে জোন্‌সের চোখমুখ জ্বল-জ্বল করে উঠল।

"উহ্, কী দুর্ধর্ষ চোর, জালিয়াত, খুনি। মিঃ হোম্‌স, ক্লে-কে গ্রেফতার করতে পারলে আমার যা আনন্দ হবে তা আর বোধহয় কিছুতেই হবে না।" তারপর মিঃ মেরিওয়েদারের দিকে তাকিয়ে জোন্‌স বললে, "মিঃ মেরিওয়েদার, জন ক্লে-র বয়েস কম বটে কিন্তু সে একটা বিরাট দলের পাণ্ডা। বিচিত্র এই ছোকরার ইতিহাস। ওর ঠাকুরদা ছিলেন ডিউক। শুনে আশ্চর্য হবেন যে, রাজ-পরিবারের সঙ্গে ওর কী যেন একটা সম্পর্ক আছে। জন ইটন স্কুল থেকে পাশ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। ও খুব ভাল ছাত্র ছিল। তারপর কী করে জানি না ও চলে এল এই অপরাধ-জগতে। অদ্ভুতকর্মা ছোকরা। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি কুশলী। অনেক ব্যাপারে ওকে আমরা সন্দেহ করেছি, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ওর টিকিটি ছুঁতে পারিনি। ও বেশিদিন একটা জায়গায় থাকে না। আজ যদি ও স্কটল্যাণ্ডে কোনো ডাকাতি করে তো ক'দিন পরেই দেখা যাবে যে, কর্নওয়ালে অনাথ ছেলেমেয়েদের আশ্রমের জন্যে টাকা তুলছে। অনেকদিন ওর পেছনে আমি লেগে আছি কিন্তু কখনও ওকে কব্জা করতে পারিনি।"

হোম্‌স বললে, "হতাশ হয়ো না। আশা করছি যে, আজ রাত্তিরে তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে। তুমি জানো না আমার নিজেরও জন ক্লে-র সঙ্গে কয়েকটা ব্যাপারে বোঝাপড়া আছে। জোন্‌স, তুমি ঠিক বলেছ, ও একটা বিরাট দলের কর্তা। যাক্, দশটা বেজে গেছে। এবার আমাদের বেরোতে হয়। জোন্‌স, তুমি আর মিঃ মেরিওয়েদার প্রথম গাড়িটায় বোসো। আমি আর ওয়াটসন পরের গাড়িটায় উঠব।"

গাড়িতে উঠে হোম্‌স মুখে তালা-চাবি দিয়ে দিলে। তারপর কখন একসময় বিকেলে সেণ্ট জেমসে শুনে আসা

একটা সুর আপনমনে গুনগুন করে ভাঁজতে লাগল। গ্যাসের নরম আলোয় আলোকিত লণ্ডন শহরের বিভিন্ন রাস্তায় গোলক-ধাঁধার মধ্যে দিয়ে আমরা কতক্ষণ চলেছি কে জানে। একসময় খেয়াল হল যে আমরা ফ্যারিংডন স্ট্রিটে এসে পড়েছি।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ হোম্‌স মুখ খুললে, "আমরা প্রায় এসে পড়েছি। এই মিঃ মেরিওয়েদার একটা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর। আজকের এই ব্যাপারের সঙ্গে ওঁদেব অনেক লাভ-ক্ষতি জড়িয়ে আছে। আর জোন্‌সকে সঙ্গে নিয়েছি তার কারণ হল যে, লোকটা ভাল, ঘটে যদিও বুদ্ধির ছিটেফোঁটা নেই। গোয়েন্দার কাজে ও একেবারেই অচল। কিন্তু ওর গুণ হল যে, ও ভীষণ জেদি আর প্রচণ্ড সাহসী। আমরা এসে পড়েছি। ঐ যে ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।"

গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে অবাক হয়ে দেখলুম যে, আজ সকালে স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে আমরা বড় রাস্তার যেখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেইখানেই এসেছি। গাড়িভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমরা মিঃ মেরিওয়েদারের পেছন পেছন হেঁটে একটা সরু গলিতে ঢুকলুম। খানিকটা যাবার পর মিঃ মেরিওয়েদার একটা খিড়কি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলুম। দরজার পরেই একটা লম্বা সরু বারান্দা। বারান্দার শেষপ্রান্তে একটা বেশ মজবুত লোহার গেট। গেট খুলে ঢুকতেই দেখলুম এবড়ো-খেবড়ো পাথরের কয়েক ধাপ সিঁড়ি এঁকেবেঁকে নীচে নেমে গেছে। সিঁড়ির শেষে আবার এক বিরাট দরজা। মিঃ মেরিওয়েদার ছোট একটা লণ্ঠন জ্বেলে সেই দরজা খুললেন। আমরা ভেতরে ঢুকতেই তিনি আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তিনি আমাদের একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে গলি দিয়ে নিয়ে চললেন। এই গলির শেষে আরও একটা বিরাট দরজা। সেই দরজাটা খুলে আমরা যেখানে এলুম সেটা মাটির তলায় একটা বিরাট ঘর। ভাল করে দেখতে দেখতে নজরে পড়ল ঘরটার চারদিকে ছড়ানো রয়েছে বিভিন্ন আকারের সব বাক্স।

লণ্ঠনের আলোয় ঘরটা তন্নতন্ন করে দেখে হোম্‌স বললে, "হ্যাঁ, ওপর থেকে এ ঘরটাকে বেশ সুরক্ষিতই বলা যায়। চট করে কেউ ঢুকতে পারবে না।"

"তলা থেকেও কেউ ঢুকতে পারবে না মিঃ হোম্‌স।" তারপর নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে মিঃ মেরিওয়েদার মেজেতে দু'চারবার ঠকঠক করে লাঠি ঠুকেই আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য, মেঝেটা কেমন যেন ফাঁপা-ফাঁপা লাগছে।"

হোম্‌স চাপা ভর্ৎসনার সুরে বললে, "দয়া করে চেঁচাবেন না। চিৎকার-চেঁচামেচি করে আপনি দেখছি আমাদের আজকের নৈশ অভিযানের সব প্ল্যান মাটি করবেন। আপনি অনুগ্রহ করে কোনো কথা না বলে যে-কোনো একটা বাক্সের ওপর চুপচাপ বসে থাকুন।"

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

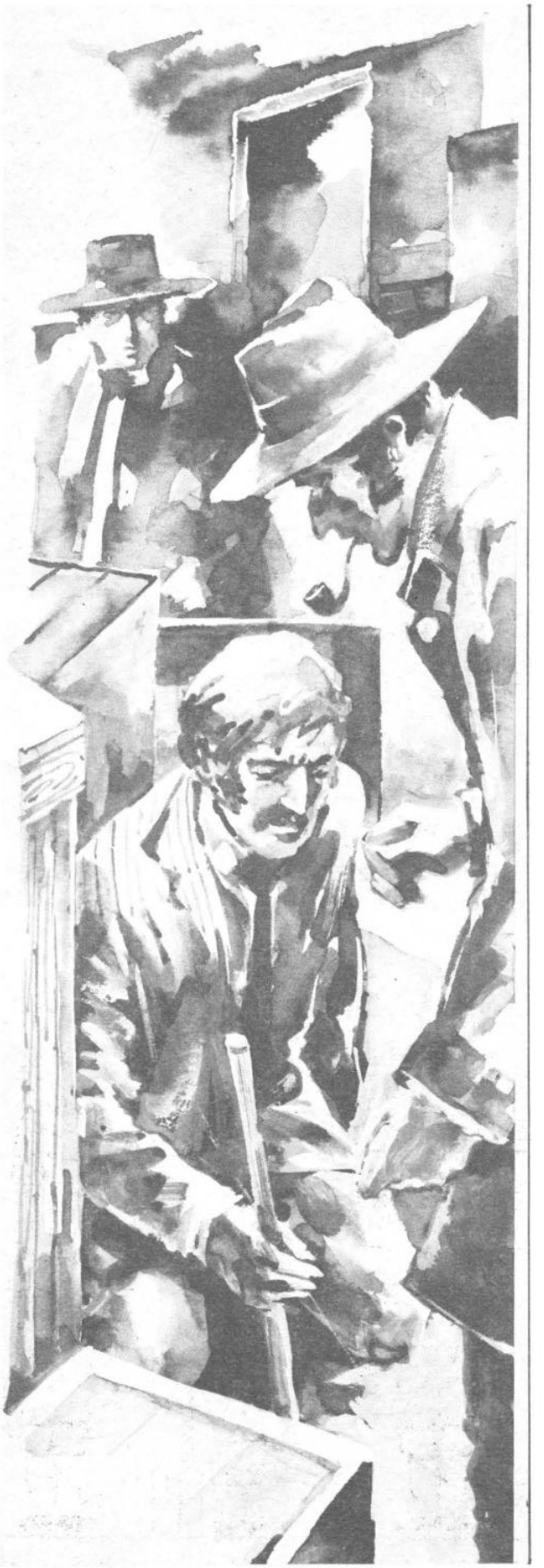

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

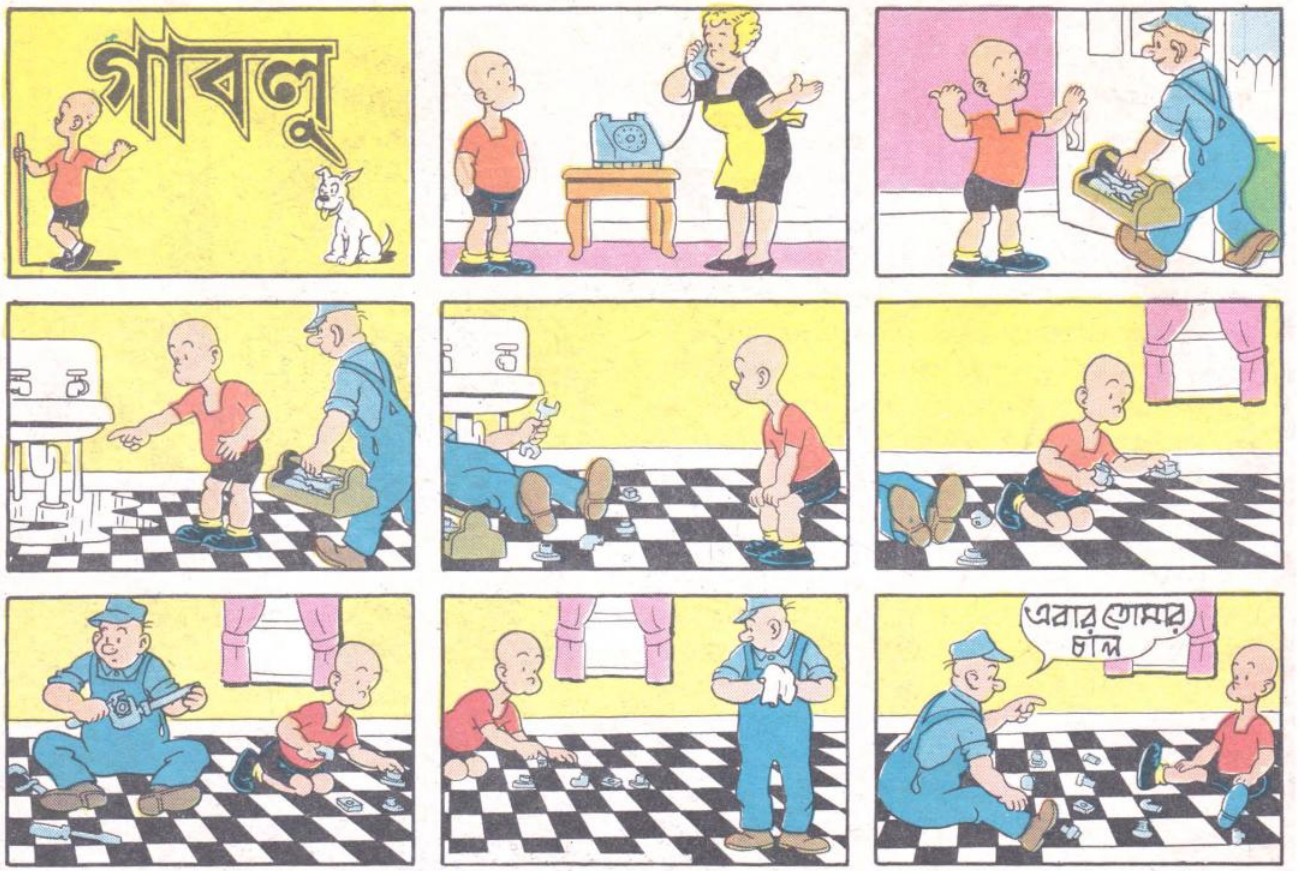

গাবলু
এবার তোমার চাল

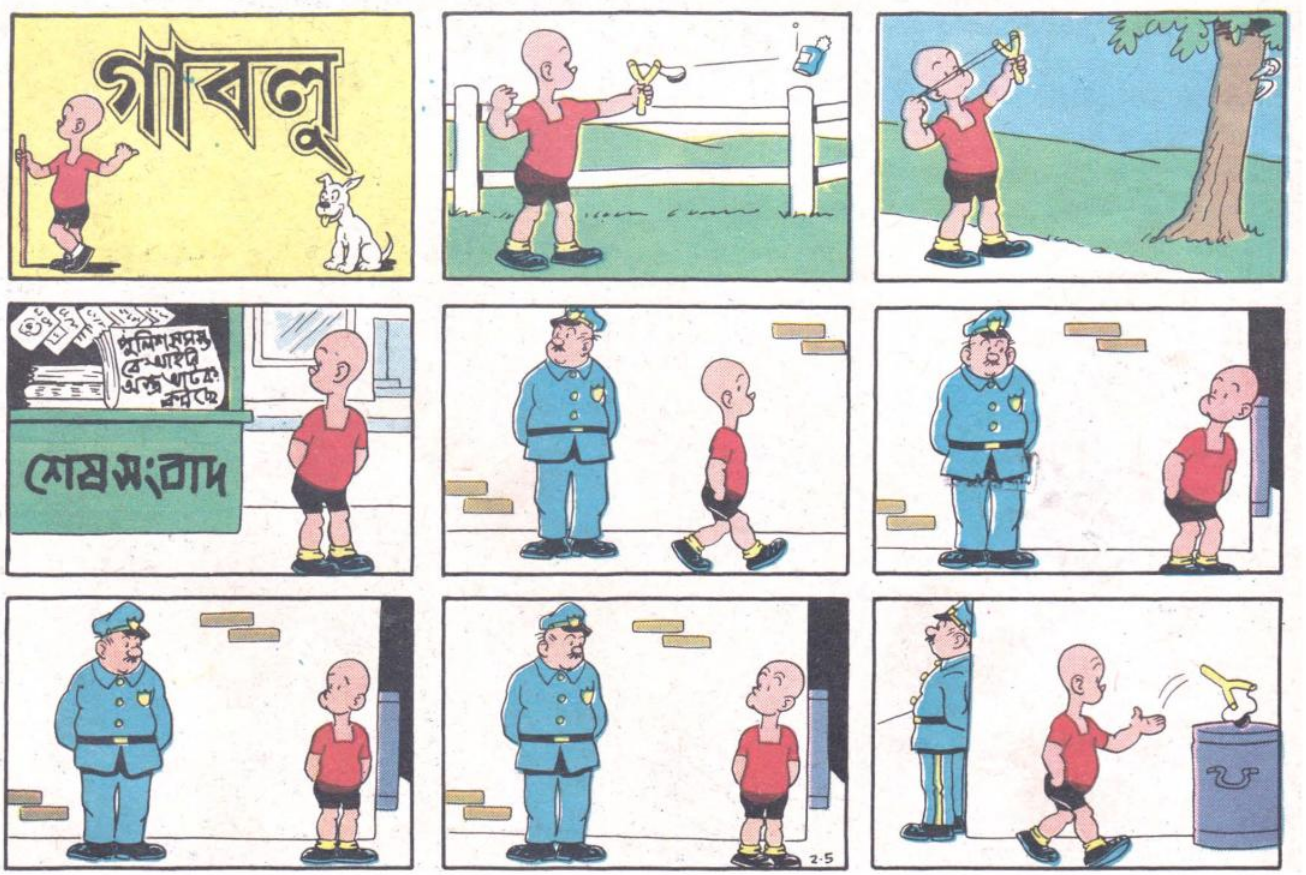

গাবলু
পুলিশ সমস্ত বেআইনি অস্ত্র আটক করছে
শেষ সংবাদ
2-5

ফ্ল্যাশ গর্ডন

বিদ্যুৎ-জাল ভেদ করে মিংয়ের প্রাসাদের দিকে...
ওই জালটাকে ভেদ করা অসম্ভব !
উপায় আছে !
জালটা হঠাৎ সরে গেল !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আবার গাওস্কর

অশোক রায়

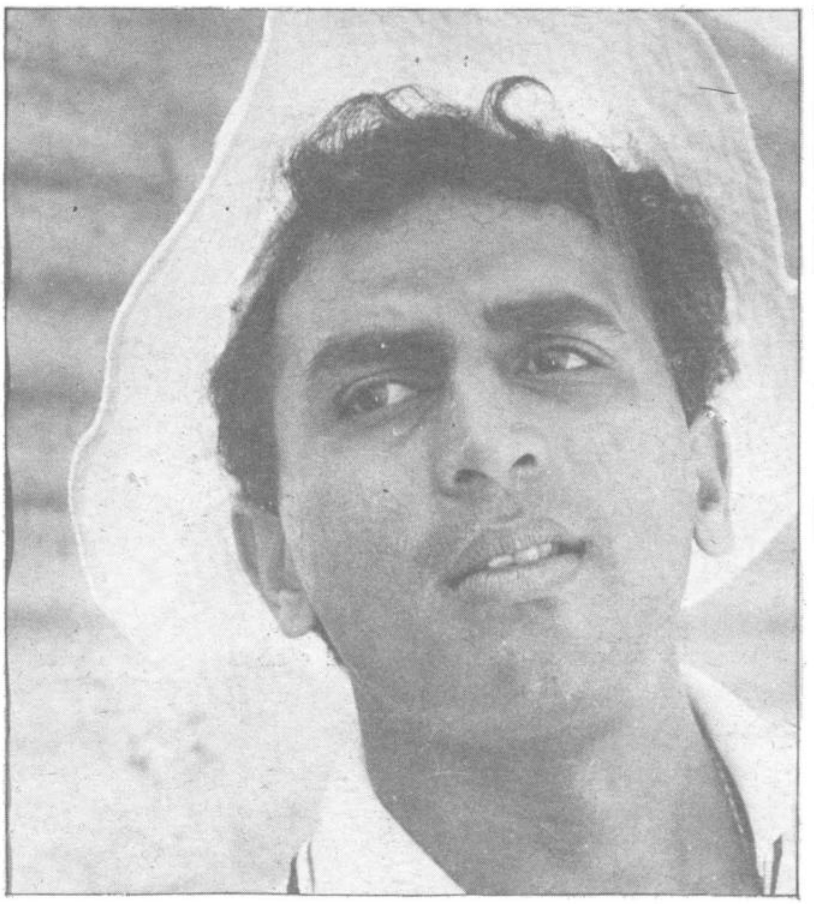

এই লেখা যখন তোমরা হাতে পাবে, তখন ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মাঠে নামছে। এবং হয়তো টিভির দৌলতে ঘরে বসেই দেখতে পাবে দশজন টগবগে ক্রিকেটারকে পেছনে নিয়ে সবার আগে মাঠে আসছেন সুনীল মনোহর গাওস্কর। হ্যাঁ, অধিনায়ক হিসেবেই।

সানি অধিনায়কত্বে ফিরেছেন। ১৯৮২ সালে এই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ০-৩ মার্জিনে সিরিজ হারার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু কলম কালি ছিটোতে শুরু করেছিল তাঁর ক্যাপ্টেনশিপের সময়কার ফাঁক-ফোকরগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে। তাঁদের কলমের জোরেই কিনা বলতে পারব না, ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তির মাথা থেকে অধিনায়কত্বের মুকুট খুলে নিয়ে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কপিলদেবের মাথায়। জয়ের সংখ্যা দিয়ে ভারতীয় অধিনায়কের গুণাগুণ বিচার করার প্রাচীন অভ্যাসটিকে আরেকবার ঝালিয়ে নিয়েছিলেন নির্বাচকরা। সুতরাং সুনীল গেলেন, এলেন কপিলদেব। এবং এসেই শুরু করলেন তোলপাড়। কপিলের নেতৃত্বে ক্লাসের লাস্ট-বেঞ্চিতে বসা ভারত একেবারে রাতারাতি প্রুডেনশিয়াল কাপ জিতে হৈ চৈ ফেলে দিল ক্রিকেট-বিশ্বে। আশ্চর্য, যে-সব কলম একদা সানির সংগ্রাম এবং শৌর্যের সাথী ছিল, তারাই মেতে উঠল কপিল-বন্দনায়। বাজি পুড়ল, পটকা ফাটল, অর্থ, সম্মান, গ্ল্যামার, প্রচার ইত্যাদি রঙিন শব্দগুলো হাওয়ায় উড়তে শুরু করল। উনিশশো তিরাশির পঁচিশে জুন রাত পোহাতেই ভারতীয় ক্রিকেটাররা হঠাৎ দেবতা হয়ে গেলেন। কিন্তু আনন্দের মুহূর্তও অমর নয়। কপিলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে দু'বার হারল ভারত, এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে সিরিজ ড্র হতেই সমালোচকদের নখ এবং দাঁতগুলি সব আঁচড়ানো আর কামড়ানোর জন্যে বেরিয়ে এল যথারীতি। ঠিক এই সময়ে হাঁটু অপারেশনের জন্য কপিল গেলেন বিদেশে। সারজায় এশিয়া কাপের জন্যে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হল আবার গাওস্করকে। সারজায় ভারত এশিয়া কাপ জিতল সানির নেতৃত্বে। এবং সেই মুহূর্ত থেকেই বাণিজ্যিক স্বার্থের তাগিদ মেটাতেই কিছু-কিছু কলম স্পষ্টতই কপিল-বিরোধী হাওয়া জাগিয়ে তুলল তাঁর অধিনায়কত্বের খুঁতগুলোকে | আতশ - কাচের তলায় ফেলে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো প্রচণ্ড

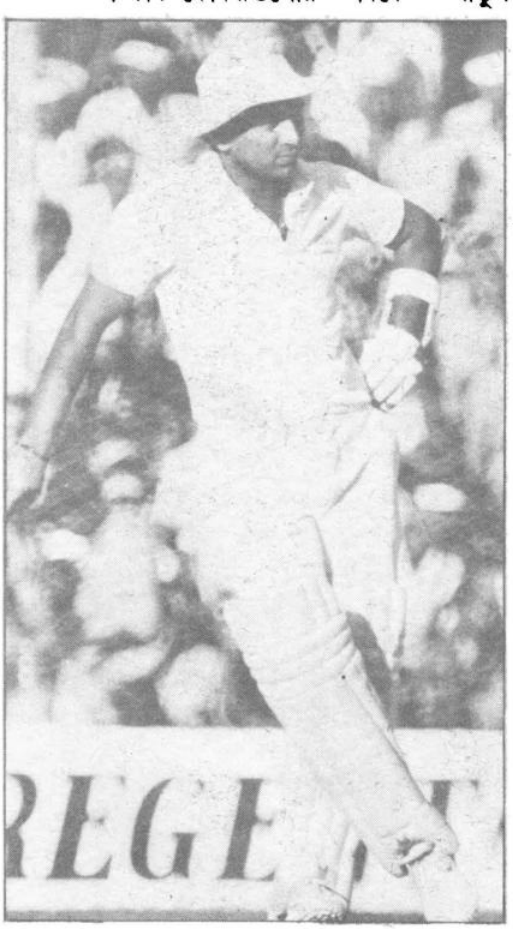

সানি : রানের জন্য প্রতীক্ষা

শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে কোনো বিপক্ষ অধিনায়কেরই যে করার বিশেষ কিছু নেই এই সহজ সত্যটা অনেকেই বুঝতে চাইলেন না, চোখের সামনে ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়াকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাতে ধ্বংস হতে দেখেও। 'কপিলদেব না গাওস্কর' এই ভয়ঙ্কর জরুরি প্রশ্নটির গায়ে একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ঝুলে থাকায় বেশ কিছুদিন উদ্বিগ্ন ছিল গোটা ভারতবর্ষ। অবশেষে বারোই সেপ্টেম্বর ফেনিয়ে ওঠা প্রশ্নটিকে মাত্র ঘণ্টাখানেক নাড়াচাড়া করে নির্বাচকরা বেছে নেন সানিকে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশের বিপক্ষে নিজেকে প্রমাণ করার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই কপিলের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল নেতৃত্বভার। হ্যাঁ, ঠিক সেইভাবে, যেভাবে একদা নিরপরাধ গাওস্করের মাথা থেকে খুলে নেওয়া হয়েছিল নেতৃত্বের মুকুট। সুতরাং এবার কপিল গেলেন, ফিরলেন গাওস্কর। যেভাবে ঘটনাগুলো ঘটল, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক ভারতীয় ক্রিকেট ক্যাপ্টেন পদটি ঠিক যেন মিউজিক্যাল চেয়ার। মুখ বদলানোর প্রয়োজনেই যেন অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে চলছে এক ধরনের ছেলেমানুষি।

কিন্তু এসব কথা আপাতত থাক। তার চেয়ে আমরা বরং দেখে নিই কেমন ক্যাপ্টেন সানি। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল গাওস্কর খুবই 'ডিফেন্সিভ' ক্যাপ্টেন। ১৯৮১ সালে কিথ্ ফ্লেচারের ইংল্যাণ্ড দলের ভারত সফরের সময় ইংরেজ ক্রিটিকরা এই অভিযোগও তুলেছিলেন যে, সিরিজকে নিরুত্তাপ এবং আকর্ষণহীন করে ফেলার ব্যাপারে গাওস্করের অতিরক্ষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিই দায়ী। হয়তো কথাটা কিছুটা সত্যি। কিন্তু পাশাপাশি এই কথাটাও সত্যি যে, একটি দুর্বল দলের দায়িত্বে থেকে ঝুঁকি নিয়ে পরাজয় বরণ করে সাংবাদিকদের বাক্যবাণে ঝাঁঝরা হওয়ার চেয়ে সম্মানজনক ড্রয়ে তুষ্ট থাকা কি একজন অধিনায়কের পক্ষে অধিক নিরাপদ নয় ? ঝুঁকি নিয়ে জয় পেলে অধিনায়ক যতটা প্রশংসা লাভ করেন, তার চেয়ে ঢের বেশি রূঢ় সমালোচনা কপালে জোটে, যদি দল পরাজিত হয়। কোনো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ক্যাপ্টেন কি অযথা ঝুঁকি নিয়ে নিজের নাক কাটার ব্যবস্থাটি নিজেই করতে চান ?

অধিনায়ক হিসেবে গাওস্করের শুরু ১৯৭৬ সালে অকল্যাণ্ডে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে। মাস্‌ল-পুলের জন্যে নিয়মিত অধিনায়ক বেদি খেলতে না পারায় ভারতের অধিনায়কত্বের বিরাট দায়িত্ব এসে পড়ে গাওস্করের ওপর। মাত্র চৌষট্টি ইঞ্চি লম্বা মানুষটির কাঁধ যে ভারতবর্ষের ভার অক্লেশে বইবার শক্তি রাখে, সেই পরিচয় পাওয়া গেল শুরুর ম্যাচেই। টসে হেরে এবং জঘন্য মানের আম্পায়ারিং সত্ত্বেও ১১৬ রানের এক অসাধারণ আত্মবিশ্বাসী ইনিংস খেললেন সানি। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সুযোগেই সেঞ্চুরি করার প্রথম ভারতীয় নজিরটি ছিল বিজয় হাজারের। সেই নামের পাশে যুক্ত হল সানির নামটিও। অফ্-স্পিনার প্রসন্নর সেরা বোলিং দক্ষতা আদায় করে সানি সেই টেস্টে জিতিয়ে দিয়েছিলেন ভারতকে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে বর্তমান টেস্ট সিরিজের আগে পর্যন্ত সানি চল্লিশটি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ন'টি করে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ছটি, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এগারোটি, নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে চারটি এবং শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একটি। গাওস্করের নেতৃত্বে ভারত জিতেছে সবসমেত ৮টি আর পরাজিত হয়েছে ৬টি টেস্টে। অন্তত পরিসংখ্যানের বিচারে প্রমাণ করা শক্ত নয় যে, এমন সাফল্যের দৃষ্টান্ত আর কোনো ভারত-অধিনায়কের নেই। এবার পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাধিকবার ভারতের অধিনায়ক হবার গৌরবটিও জমা পড়বে সানির জিম্মায় (এতদিন এই রেকর্ডটির যুগ্ম অংশীদার ছিলেন মনসুর আলি পতৌদি)। অধিনায়ক হিসেবে চল্লিশটি টেস্টে সানির সংগ্রহ ৩১৮৯ রান। ক্যাপ্টেন সানির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এই প্রসঙ্গে ফিরে দেখা যেতে পারে। অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে সর্বোচ্চ রানের ভারতীয় রেকর্ডটি (২০৫ রান) সানি গড়েন ১৯৭৮-৮৯ সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে বোম্বাইতে (আগের রেকর্ড ছিল পতৌদির)। এ ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত টেস্ট-প্লেয়িং দেশের বিরুদ্ধেই অধিনায়কত্ব এবং সেঞ্চুরি করার বিশ্বরেকর্ডও রয়েছে

কপিল : দৌড় শুরু করবার আগে

সানির দখলে।

ব্যাটসম্যান হিসেবে বহু বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী সুনীল মনোহর গাওস্করের ওপর ঠিক এই মুহূর্তে তেমন কোনো চাপ নেই। ব্রাডম্যানের ঊনত্রিশটি টেস্ট সেঞ্চুরির এবং জিওফ বয়কটের সর্বাধিক টেস্ট রানের বিশ্বরেকর্ড দুটি ভাঙার আগে পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ইনিংসে অমানুষিক মানসিক চাপ ছিল গাওস্করের ওপর। রেকর্ড দুটি কব্জায় আনার পরে স্বাভাবিকভাবেই সানি এখন চিন্তামুক্ত। তাই সানির কাছে আমাদের প্রত্যাশা এখন বিরাট। গত ২৯টি টেস্টে ভারত জয়ের মুখ দেখেনি। এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ওই দেশের মাটিতে আমরা আজ পর্যন্ত একটিও জয় পাইনি। ক্রিকেট রেকর্ড-বুকে এক গৌরবময় পরিবর্তনের সূচনা কি সানির নেতৃত্বে এবারে সম্ভব হবে ?

কিছু বস্তু জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যায়, শতবর্ষ কেটে গেলেও যার বন্ধন অটুট থেকে যায়!

শতবর্ষ আগে হয়েছিল এক পরম্পরার উদয় –
আর ঐ উদয়-সূর্যের উজ্জ্বল ছটা, দুনিয়ার দূর-দূরান্তের
দেশে দেশে ছড়াতেই থেকেছিল..... ঘরে ঘরে,
দিদিমা থেকে নাতনী, সবার কাছে।

সেটি ছিল সানলাইট-এর পরম্পরা – বিশুদ্ধতা ও
কোমলতায় ভরা এই পরম্পরা, যার নিত্য পরিবর্তনশীল
এই যুগও না আজ পর্যান্ত পেরেছে কোনো পরিবর্তন
আনতে, আর না তা কোনোদিন পারবে। কারণ,বিশুদ্ধতার
ঐ পরম্পরাকে শত শত বর্ষ ধরে কায়েম রাখার জন্যে
যে আমরা শত কঠিন কাজও হাসিমুখে করতে তৈরী রয়েছি।

সানলাইট সাবান ১০০ বছর ধরে চলে আসছে বিশ্বাসযোগ্য পরম্পরা

LINTAS SUN 11 2116 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

আজকের মাঠে গতকালের তারকা

মণি শর্মা

আসলে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয়, ওটা ছিল সঠিক অর্থে লঘু মেজাজের প্রদর্শনী ফুটবল খেলা। উপস্থিত দর্শকদের কেউ ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এ নিয়ে কোনো আগাম জল্পনা-কল্পনাও পাড়ার রক বা চায়ের টেবিল গরম করেনি। আসলে প্রত্যাশা ছিল পুরনোদের নতুন করে ফিরে পাবার। অতীত দিনের ময়দান-কাঁপানো খেলোয়াড়রা আবার মাঠে নামবেন, কে কেমন খেলবেন সেটা ছিল আলোচ্য বিষয়। পারবেন কি ইন্দার আগের মতো রুমাল-পরিমাণ জায়গায় পায়ের কাজ দেখিয়ে দুজন ডিফেণ্ডারকে ছিটকে দিতে? চুনী গোস্বামীর ছবির মতো ড্রিবলিংয়ের কিছু আজও অবশিষ্ট আছে কি? বয়স সব কিছু গিলে না ফেললে ছিটেফোঁটা এখনও হয়তো দেখা যাবে। আমেদ খানের খেলায় তাঁর উজ্জ্বল দিনের সোনালি মুহূর্তগুলোর অস্পষ্ট ছায়াও যদি কিছু থাকে, একালের সেটাই মস্ত বড় পাওনা। পি· কে·র দুর্দান্ত গতির বিন্দুমাত্রও যদি আর-একবার দেখা যায়! রহমানের দুর্ভেদ্যতা, জার্নেলের পাহাড়প্রমাণ আত্মবিশ্বাস, অরুময়ের তীক্ষ্ণতা বা বলরামের অনুপম শিল্পকলা, এর কণা পরিমাণের স্বাদ পাওয়ার জন্য মাঠে ছুটে এসেছিলেন হাজার হাজার দর্শক। আবার থঙ্গরাজ, সুভাষ ভৌমিক, বীরবাহাদুর, সাত্তার, ধনরাজ, নারায়ণ! খুব বড় কোনো প্রত্যাশা নয়, একালের ফুটবল-পাগলেরা ১৩ সেপ্টেম্বর মোহনবাগান মাঠে জড়ো হয়েছিলেন নিজেদের মনের খোরাক জোগাড় করে নিতে যতটা পারা যায়।

চার সময়ের ফুটবলাররা ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন চারটি দলে। দুটি খেলা হল। প্রথম ম্যাচ ছিল ব্রিটানিয়া দল এবং ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক দলের মধ্যে। ব্যাংক দলে আজকের ভারতীয় ফুটবলের তারকাদের সমাবেশ। অন্য দলে আগের দশকের ফুটবলাররা। খেলা শেষ হল অমীমাংসিতভাবে, ১-১। ব্রিটানিয়া দলের পক্ষে গোল করেছেন ইন্দার সিং। চমৎকার গোল। গোল করা মাত্র উপস্থিত দর্শকেরা সহর্ষ চিৎকারে ইন্দারকে অভিনন্দন জানান। হাত তুলে অভিনন্দন গ্রহণ করেছেন ইন্দার। ব্যাংকের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেছেন মানস ভট্টাচার্য।

স্বপন ডেয়ারি প্রডাক্ট দল দ্বিতীয় খেলায় বোরোলিন দলের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জেতে। পায়ের ব্যথার জন্য চুনী গোস্বামী মাঠে নামতে চাইছিলেন না। মাঠ জুড়ে চিৎকার ওঠে। তারপর পি·কে·র একান্ত অনুরোধে চুনী মাঠে আসেন। সেই গতি নেই। থাকা কি সম্ভব? তবু ছোট ছোট দুয়েকটি কাজ মনে করিয়ে দিল, এককালে কী প্রতিভা ছিল তাঁর। প্রদীপ ব্যানার্জির ডান পায়ের তীব্র শট উল্লাস ছড়িয়ে দিল প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে। কাঁটার মাপে পাস করে বলরাম এই বয়সেও চমকে দিলেন আমাদের। কিছু যোগ-বিয়োগ করে নিলে কান্নন এখনও বোধহয় কলকাতা-মাঠে নেমে যেতে পারেন। পারেন অরুময়নৈগমও। গতি এবং শিল্পে আজও তিনি অনেকের ঈর্ষার পাত্র।

এই অরুময়ের কাছ থেকে পাওয়া বলে চমৎকার ভলি মারলেন পরিমল দে। আমাদের মনে অমনি ভেসে উঠল পরিমল দে'র গোলক্ষুধার কথা। দুটো গোল করেছেন তিনি। অসীম মৌলিককে যাঁরা [illegible]ন ধরে দেখেন না, এখন তাঁকে [illegible]ল তাঁরা চমকে যাবেন। বিরলকেশ, চোখে-মুখে বয়সের ছাপ। তাঁর বিখ্যাত 'হেড' দেখতে চেয়েছিল সবাই। আলতাফ আমেদ চমৎকার খেলেছেন। বেশি মোটা হয়ে গেছেন দামোদরন। তাঁর মেদবহুল শরীর নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছে দর্শকরা। প্রথমে কিছুক্ষণ খেলার পর মাটিতে বসে হাঁপাচ্ছিলেন দামোদরন। খানিক পরে বলরাম এসে তাঁকে ফের মাঠে নামানোর চেষ্টা করেন। প্রথমে কথা; তারপর টানাটানি। বলরাম অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে নড়াতে পারেননি। দর্শকদের আরেক দফা হাসি।

খেলাশেষে ফুটবলার্স' ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই অনুপম বিকেলে দুঃস্থ প্রাক্তন ফুটবলার মারি কানাইয়ানের হাতে তিরিশ হাজার একান্ন টাকার ব্যাংক ড্রাফট তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এই সাহায্য গ্রহণ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন কানাইয়ান। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেছেন, "সকলের কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। মৃত্যু পর্যন্ত একথা আমার স্মরণে থাকবে।"

বাঁয়ে বলরাম, ডাইনে ধনরাজ, তাঁর পাশেই আমেদ

ইরানি ট্রফি জিতল অবশিষ্ট ভারত

ব্যাটবয়

মনিন্দর সিং। ছেলেটাকে প্রথম যখন দেখি, চমকে উঠি। এক ফোঁটা ছেলে। আন্তর্জাতিক আসরে বাঘা ব্যাটসম্যানদের মুখে গিয়ে পড়েছে। দফা গয়া হয়ে যাবে একেবারে। রান আটকে রাখা ছাড়া আর কিছুই তো ও করতে পারবে না। অথচ দেশীয় ক্রিকেটে আমরা দেখেছি, স্পিন বোলিংয়ে তার দক্ষতা চমৎকার। সেই মনিন্দর বুক চিতিয়ে যখন ফ্লাইটের কারুকাজে ব্যাটসম্যানকে প্রলুব্ধ করার কাজে লেগে গেল, বিস্মিত হলাম। মিয়াঁদাদ, জাহির, ওয়াসিম রাজা, মহসিন এবং ক্রমে লয়েড, রিচার্ডস, গ্রিনিজ ও দুজোঁর বিরুদ্ধে সে যেভাবে তার চাতুর্যের প্রদর্শনী সাজিয়েছিল, তাতে তেমন ধ্বংসমূলক সাফল্য কিছু আসেনি বটে, তবে ভবিষ্যতে ভারতের স্পিন বোলিংয়ের কর্ণধার হিসেবে ছাপ পড়েছিল তার নামের উপরে। আজ সেটা সর্বজনস্বীকৃত। বিষেণ সিং বেদীর এই সুযোগ্য শিষ্যের সম্পর্কে সেদিন যাঁরা নাক বাঁকিয়েছিলেন, আজ দেখছি তাঁদের কথাবার্তায় অন্যরকম সুর লেগেছে। কবজির জোরে সে থেঁতলে দিয়েছে তার বিরুদ্ধবাদীদের মুখ। যেমন করে ইরানি ট্রফিতে থেঁতলে দিয়েছে

মনিন্দর সিং : স্পিনের নতুন জাদুকর

সুরিন্দর খান্না : ব্যাট ঘোরালেই রান

বোম্বাইয়ের অহঙ্কার।

প্রথম ইনিংসে মনিন্দর উইকেট পেয়েছে মাত্র দুটি। কিন্তু ঝাঁকি দিয়েছে বেশি। বেংসরকরকে সে নাচিয়ে আউট করেছে, এবং গুলাম পারকারকে কাঁদিয়েছে ফ্লাইটে। এরপরে ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানকেও মনিন্দর চ্যালেঞ্জ জানায়। আশ্চর্য, গাওসকরও অস্বস্তি বোধ করেছেন। এবং অধিকাংশ সময়ই তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছে মনিন্দরকে ঠেকিয়ে রাখার কাজে। এমন অবস্থা একসময় এসেছিল, যখন অবশিষ্ট ভারতের বোলিংয়ের দাপটে বোম্বাই নড়বড় করছে। দুশো পেরোতে পারবে কিনা সন্দেহ। এই অপমানকর অবস্থা থেকে বোম্বাইকে বাঁচান রবি শাস্ত্রী এবং চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। সেইসঙ্গে সাহায্য করেছে বিপক্ষের দুর্বল ফিল্ডিং। সব মিলিয়ে ২৩৬ রানে দান ফুরোলেও, বোম্বাইয়ের স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল না।

সামনে অনেকগুলো একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ। তাতে ভারতীয় দলে নিজের জায়গা কায়েম করার চিন্তা মাথায় রেখে ব্যাট ঘোরালেন সুরিন্দর খান্না। রান ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে গেল। আর তারপরেই বিপাকে পড়ল অবশিষ্ট ভারত। রান সওয়া শো-ও হল না, পড়ে গেল পাঁচটা উইকেট। এবার ক্যাপটেন খেললেন ক্যাপটেনের মতো। কপিলদেবের সাহস আর শক্তির জোরে উতরে গেল অবশিষ্ট ভারত। উতরোত না, যদি বোম্বাই একটু আঁটোসাঁটো ফিল্ডিং করতে পারত। ক্যাচ ফেলার গুনাগার দিতে বোম্বাই দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে ৫৭ রানে পিছিয়ে থেকে।

বোম্বাইকে টুকরো করে ফেলতে কপিল ও মনিন্দরের বল রচনা করল ভয়ানক আক্রমণ। বেংসরকর হতাশ হলেন, পাটিল দ্বিখণ্ডিত। গাওসকর ও শাস্ত্রী ঢাকা পড়ে গেলেন মনিন্দরের ছায়ায়। ঠেকা দিতে পারলেন কেবল গুলাম পারকার আর বলবিন্দার সিং সাঁধু। ইরানি ট্রফি হেলে পড়ল অবশিষ্ট ভারতের দিকে। খুশি ক্যাপটেন পিঠ চাপড়ে দিলেন মনিন্দরের। চারটে উইকেট তাঁর ব্যাগে। প্রেরণাদাতা কপিলের ঝুলিতে তিনটে। ক্যাপটেন অনেক আশা নিয়ে তার হাতে বল তুলে দিয়েছিলেন, সেই আস্থার মর্যাদা রাখতে পেরে মনিন্দর খুশি। ১৬৩ রানে খতম হয়ে গিয়েছে বোম্বাই।

জেতার জন্য বাকি ছিল অল্প রান। শেষ পর্যন্ত চার উইকেটে জিতে যায় অবশিষ্ট ভারত। হায়দরাবাদের তরুণ ব্যাটসম্যান আজহারউদ্দিন প্রথম দফায় গোল্লা করলেও, দ্বিতীয় পর্যায়ে সবার মন মাতিয়েছেন। আকাশলাল তো বলেই ফেললেন, "আজ যে খেলা দেখলাম, তাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, আজহার একদিন ভারতীয় দলে আসবেই।"

"চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের ক্ষেত্রেও আমার এমনই একটা বিশ্বাস কাজ করে। অদূর ভবিষ্যতে যে-দিন কিরমানি প্যাভিলিয়নে বসে শুধু খেলা দেখবেন, সে-দিন হয়তো আমরা চন্দ্রকান্তকে ব্যস্ত থাকতে দেখব উইকেটের পেছনে।"

শুধুমাত্র দুধ থেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্তন
আপনার বাচ্চার পক্ষে সহজতর করে তুলুন...

নেস্টাম: সহজতর পরিবর্তনের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী বেবী সিরিয়াল।

আপনার শিশুর জন্যে সবসেরা জিনিষটিই আপনার চাই। সেই জন্যেই আপনি তাকে বুকের দুধ খাওয়ান —যা সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়।

যখন তার বয়স প্রায় চারমাস তখন তার শক্ত আহারেরও প্রয়োজন। কিন্তু তার হজমশক্তি তখনও অত্যন্ত কোমল। তখন তার প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়াল যা সে সহজে হজম করে। যেমন, নেস্টাম।

প্রথম শক্ত আহার হিসেবে নেস্টাম আদর্শ কারণ তা চাল থেকে তৈরী। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে অন্যান্য যে কোনও সিরিয়াল থেকে নেস্টাম-ই হল সহজ পাচ্য।

দুধের সঙ্গে প্রস্তুত করলে, নেস্টাম পুষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ খাদ্যে পরিণত হয় আর এতে থাকে অতি প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিকর পদার্থ। শিশুর ত্বককে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে, তার দৃষ্টিশক্তিকে সচ্ছ ক'রে আনতে এবং তার রোগ প্রতিরোধের সহজাত ক্ষমতা বাড়াতে এতে রয়েছে সেইসব ভিটামিন। নেস্টামে যে আয়রণ আছে, তাতে রক্ত বিশুদ্ধ রাখে, এর ক্যালসিয়ামে করে হাড় ও দাঁত শক্ত।

দুধের সঙ্গে নেস্টামের ব্যবহার বহুমুখী। তা'ছাড়া সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও চটকানো তরকারী এবং ডালের সঙ্গেও নেস্টাম দেওয়া চলে।

বিনামূল্যে!

আপনার শিশু তার খাবারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে। অতএব বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি ফোল্ডারের জন্যে লিখুন:

নেস্টাম
পোষ্ট বক্স নং 6016 নিউ দিল্লী 110 008

তৈরী করা খুব সোজা।

আগে ফোটানো কুসুম-গরম দুধ ঢালুন।

নেস্টাম মিশিয়ে নিন।

এবার খেতে দিন।

আয়রণ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ

নেস্টাম

বেবি সিরিয়্যাল

দুধের সঙ্গে মেশান

NESTLÉ

SAA/FSL/N/3150 BEN

SAA/FSL/N/3150 BEN

17 OCTOBER 1984 REGD. NO. WB/CC/264